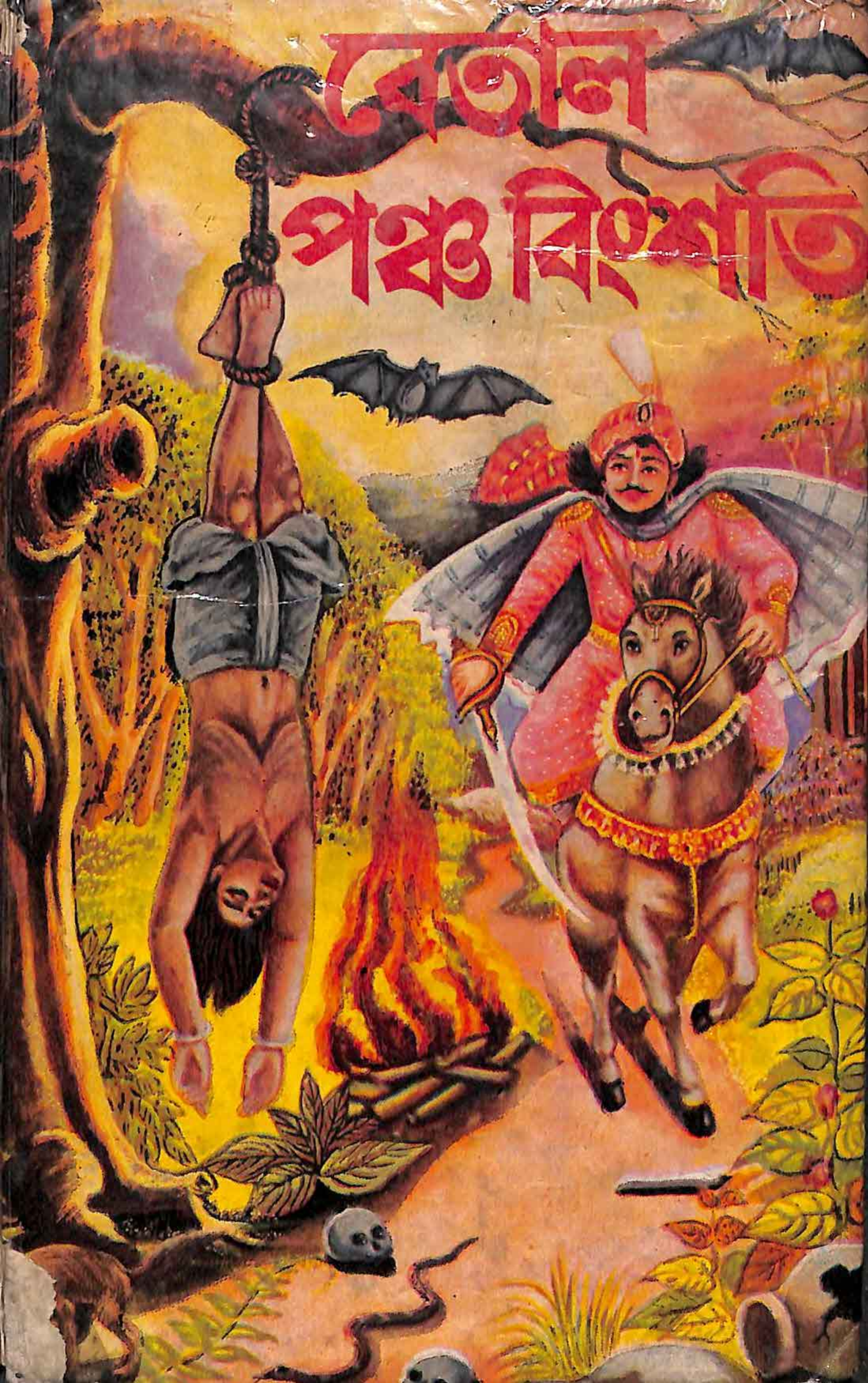

বেতাল
পঞ্চবিংশতি

ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রকাশক
দুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মূল্য ঃ দশ টাকা

মুদ্রাকর
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

—ঃ গোড়ার কথা ঃ—

বেতাল পঞ্চবিংশতি বইখানি রচনা করেছিলেন শিবদাস। এর রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। তবে এই বই-এর গল্পগুলো খুবই পুরোণ। এই বই এর রচয়িতা হিসেবে জম্বল দত্তের নামও পাওয়া যায়। জার্মান পণ্ডিত ভেবার বলেন বইখানি নাকি বেতালভট্টের রচনা। 'কথাসরিৎসাগর'—এ সব গল্পগুলোই গ্রহণ করেছিলেন সোমদেব। কাশ্মীরি সাহিত্যিক আচার্য ক্ষেমেন্দ্র 'বৃহৎ কথামঞ্জরীতেও এই গল্পগুলো পাওয়া যায়। যার ফলে এ গল্পগুলো খুবই জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠে। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব একাদশ শতকের মানুষ ছিলেন। সুতরাং গল্পগুলোর মূল যে আরো পুরোণো তা সহজেই অনুমেয়।

বেতাল পঞ্চবিংশতির রূপান্তর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এমন কি তিব্বতী ভাষাতেও পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর বলেছেন, 'তিনি এই বইখানির বাঙলা অনুবাদ তৈরি করেছিলেন হিন্দী সংস্করণ "বেতাল পচ্চিসি" থেকে। বইখানি বিদেশের নানা ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

মূল সংস্কৃত কাহিনীগুলি বহুযুগ ধরে বিভিন্ন জনের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও, এর আবেদন, এর দীপ্তি, এর মনোগ্রহিতা আজও অম্লান। এই বহু পুরাতন তবু চিরনূতন কাহিনী-গ্রন্থ নতুন করে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরিয়ে যায়নি।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, যদি সকলের কাছে নিজের জন্য একটু স্থান করে নিতে পারে, তবেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব।

—প্রকাশক

॥ সূচীপত্র ॥

॥ বেতাল ঃ রাজা বিক্রমাদিত্যের কাহিনী ॥

উজ্জয়িনীর রাজা গন্ধর্ব সেন। তাঁর চার রাণী ও ছয় পুত্র ছিল। রাজকুমারেরা সকলেই বিদ্যা, শিক্ষা, শাস্ত্রানুশীলন ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শি ছিলেন।

একদিন রাজা গন্ধর্ব সেনের মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র শঙ্কু উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসনে বসলেন। রাজা গন্ধর্ব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিক্রমাদিত্য ও শঙ্কুর চেয়ে কিছু কম ছিলেন না। তিনিও সর্ব-বিদ্যায় পারদর্শী। শঙ্কুর প্রভুত্ব ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠল বিক্রমা-দিত্যের। তখন তিনি শঙ্কুকে হত্যা করে একছত্রী সম্রাট হলেন উজ্জয়িনীর।

বিক্রমাদিত্য রাজা হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই একাধিপত্য লাভ করলেন বিস্তীর্ণ জম্বুদীপের। আপন নামে বিক্রমাব্দ প্রচার করলেন।

প্রজানুরঞ্জনে, দয়া ও দাক্ষিণ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য জনসাধারণের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। একদিন সহসা তাঁর মনে উদয় হল, ভগবান আমাকে এত বড় একটা বিরাট রাজ্যের একচ্ছত্রী সম্রাট করে পাঠিয়েছেন। আমি প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কি করছি, পরের কথার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে ভোগ বিলাসে দিন যাপন করছি। আমার রাজত্বে প্রকৃত পক্ষে সকলে সুখী কি'না গুপ্তভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। এই ভেবে তাঁর অন্য আর এক ভ্রাতা ভর্তৃহরির হস্তে রাজ্যের সমুদয় ভার অর্পণ করে তিনি ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন দেশ ভ্রমণে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। দারিদ্র মোচনের জন্য তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন। কিছুদিন উগ্র তপস্যার ফলে তাঁর ইষ্টদেব সন্তুষ্ট হলেন। ব্রাহ্মণ ইষ্টদেবের

নিকট হতে একটা "অমর ফল" নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। এসে তাঁর স্ত্রীকে বললেন দেখ আমার ইষ্টদেবতা আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এই অমর ফলটি দিয়েছেন। এটি খেলে চিরদিন অমর হয়ে থাকব। ব্রাহ্মণী শুনে প্রচণ্ড রাগ করে বললেন, 'হায়! অমর হয়ে আর কতকাল এই পৃথিবীতে যন্ত্রণা ভোগ করবে। তুমি কি সুখের জন্য অমর হবার অভিলাষ কর বুঝতে পারছি না। বরং, এখন মৃত্যু হলে সাংসারিক চিন্তা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যেত। ব্রাহ্মণী আরও বললেন, "এই ফল রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়ে তার পরিবর্তে কিছু অর্থ নিয়ে এস, তাহলে অনায়াসে সংসার যাত্রা সম্পন্ন করতে পারবে। ব্রাহ্মণ অমর ফলটি এনে রাজা ভর্তৃহরিকে প্রদান করলেন। রাজা ভর্তৃহরি ফলের গুণাগুণ শ্রবণ করে ব্রাহ্মণকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়ে ফলটি গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণ আশাতীত অর্থ রাশি নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। অমর ফলটি হাতে নিয়ে রাজা ভেবে স্থির করলেন এই ফলটি আমার প্রিয় মহিষীকে খাওয়ালে সে চিরজীবি ও চির যৌবনা হয়ে থাকবে।

রাজা ভর্তৃহরি অন্তঃপুরে গিয়ে অমর ফলটির গুণাগুণ জানিয়ে রাণীকে খেতে অনুরোধ করলেন। রাণীও রাজার হাত হতে আহ্লাদে ফলটি নিলেন। রাজা রাণীর হাতে ফলটি দিয়ে মহানন্দে রাজসভায় চলে গেলেন।

উজ্জয়িনীর নগর পাল রাজমহিষীর প্রিয় ছিলেন। তিনি অমর ফলের গুণ বর্ণনা করে ফলটি নগর পালকে আহার করতে দিলেন। নগর পাল রাণীর হাত থেকে ফলটি নিয়ে চলে গেল। নগর পালের চরিত্র ভাল ছিল না। সে আর এক রমণীকে ভালবাসত। ফলটি তাকে খেতে দিল। সে রমনী ফলটি নিয়ে মনে ভাবল আমি উঞ্ছবৃত্তিতে জীবন যাপন করে আসছি, আমার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। তার চেয়ে এই ফলটি দেশের রাজাকে দান করলে অনেক ভাল কাজ হবে। রাজা হাজার লোকের অন্নদাতা। তিনি

চিরজীবি হয়ে থাকলে লোকের মঙ্গল হবে। এই চিন্তা করে রমণী অমর ফলটি নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হল। এবং ফলটির গুন বর্ণনা করে রাজার হাতে তুলে দিল।

রাজা রমণীর হাত থেকে ফলটি নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। কোন কথা না বলে ফলের মূল্যস্বরূপ প্রভুত অর্থ দিয়ে রমণীকে বিদায় করলেন। রমণী চলে গেল। রাজা ভাবতে লাগলেন, আশ্চর্য্য ! এ ফল এ রমণী কোথা হতে পেল। তিনি অচিরাৎ বিশেষ অনুসন্ধান করে ফলটি হস্তান্তরের রহস্য জনক কাহিনী অবগত হলেন। তারপর হতে তাঁর সংসারের উপর একটা মহাঘৃণার রেখাপাত করল। তিনি স্থির করলেন সংসার অতি ঘৃণ্যস্থান। এখানে শুধুই অশান্তির চিতাবহ্নি ধূ ধূ করে জ্বলছে। মায়ামুগ্ধ মানুষ তাতে জলে পুড়ে মরছে এ সংসারে আর আমি এক মুহূর্ত থাকব না, কোন নির্জন অরণ্যে বনে ভগবানের আরাধনা করে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেব !

রাজা ভর্তৃহরি রাজকার্য্য অমাত্যদের বুঝিয়ে দিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাত হতেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাণী। আমি তোমাকে যে ফলটি ভক্ষণ করতে দিয়েছিলাম সেটি কি ভক্ষণ করেছিলে ? রাণী সঙ্গে সঙ্গেই 'হাঁ খেয়েছি' বলে উত্তর দিলেন। তখন রাজা বললেন—খেয়েছ যদি তবে আমার কাছে সে ফল আবার এলো কোথা হতে ?

এই বলে ফলটি বের করে রাণীকে দেখালেন। রাণী নির্বাক, হতবুদ্ধি ও অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজা কোন কথা আর না বলে অন্তঃপুর হতে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ফলটি নিজেই ভক্ষণ করে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, পরিজন সব জলাঞ্জলি দিয়ে অরণ্যে গিয়ে যোগ সাধনায় ব্রতী হলেন।

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসিংহাসন শূন্য। অরাজকতা মহারাণীর মত দেখা দিল রাজত্বে। অন্তরীক্ষ হতে দেবরাজ ইন্দ্র

দেখলেন বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীর সংকট অবস্থা। তিনি তখন উজ্জয়িনীর রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য এক যক্ষকে পাঠালেন।

যক্ষ এসে উজ্জয়িনী রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন। চারদিকে প্রচার হতে বিলম্ব হল না, যে রাজ ভ্রাতা ভর্তৃহরি সন্ন্যাসী হয়ে বানপ্রস্থে প্রস্থান করেছেন। এ সংবাদ বিক্রমাদিত্যেরও শুনতে দেরী হল না। বিক্রমাদিত্য তাঁর রাজহীন রাজ্যের অবস্থা ভেবে দেশে ফিরলেন।

যখন তিনি নগর মধ্যে প্রবেশ করলেন, যক্ষ এসে বাধা দিল। রাজা বললেন, আমিই রাজা বিক্রমাদিত্য, এই বিশাল রাজত্বের আমি একমাত্র অধিকারী, আমি আমার নিজ রাজত্বে প্রবেশ করছি—তুই কে আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিস ?

যক্ষ বলল—হতে পারেন আপনি রাজ্যের অধিপতি, কিন্তু আমার অপরিচিত। দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে নগর রক্ষার ভার অর্পন করেছেন। যদি আপনি প্রকৃত বিক্রমাদিত্য হন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে নগর মধ্যে প্রবেশ করুণ। তখন যক্ষ ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধল। রাজা বিক্রমাদিত্য যক্ষকে ভূতলশায়ী করে তার বুকের উপর বসলেন। যক্ষ বললেন—মহারাজ এখন মনে হচ্ছে আপনি প্রকৃতই উজ্জয়িনীর রাজা ! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে প্রাণ দান করব।

বিক্রমাদিত্য হেসে বললেন, তুই বাতুল ! আমি আমার পরাক্রমে তোকে ভূতল শায়ী করেছি—তুই আমার প্রাণ দান কি করে করবি ? তখন যক্ষ হেসে বলল, মহারাজ ! আমি আপনাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাব। আর আমার কথামত কাজ করতে পারলে দীর্ঘজীবি হয়ে এই পৃথিবীতে একাধিপত্য লাভ করবেন। তখন বিক্রমাদিত্য যক্ষের বুক হতে উঠে বসলেন। যক্ষ একটু বিশ্রাম করে বিক্রমাদিত্যের জীবন আলেখ্য বলতে শুরু করল।

ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে এক অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মৃগয়ার অভিপ্রায়ে এক বনে প্রবেশ করে দেখলেন, এক সাধু মাথা নিচের দিকে ও পা আকাশের দিকে করে ধ্যান করছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি লোকের মুখে শুনলেন, সাধু কারোর সাথে কথা বলেন না, বহুকাল ধরে একা এইভাবে তপস্যা করছেন। রাজা সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত দেখে আশ্চর্য হয়ে নগরে ফিরে এলেন। পরদিন রাজসভায় বসে তিনি বললেন, 'হে অমাত্যবর্গ! হে সভাসদগণ! আমি গতকাল মৃগয়ায় যেয়ে এক অদ্ভুত সাধুকে দেখেছি,যদি কেউ তাঁকে রাজধানীতে আনতে পারে তাঁকে লক্ষ্য মুদ্রা উপহার দেব।

এই রাজবাক্য সারা নগরে ছড়িয়ে পড়লে এক প্রসিদ্ধ বারবণিতা রাজার সামনে এসে বললো, 'মহারাজ! আদেশ পেলে আমি ঐ সাধুর ঔরসে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়ে ঐ পুত্র তার কাঁধে চাপিয়ে আপনার রাজসভায় আনতে পারি।'

রাজা শুনে চমকে উঠলেন এবং বারনারীকে সাধুকে আনার ভার দিলেন। সে রাজার অনুমতি পেয়ে সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখল সাধু মাথা নীচের দিকে ও পা উপরের দিকে তুলে একটা গাছের ডালে ঝুলে আছে; কেউ কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দেন না। এই দেখে বারবণিতা সন্ন্যাসীর তপস্যা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত মনে করল না তাই আশ্রমের কাছে একখানা ঘর তৈরী করল এবং নানা উপায় চিন্তার পর কিছু মোহনভোগ তৈরি করে এনে সাধুর মুখে তুলে দিল। সাধুর খেতে মিষ্টি লাগায় তিনি পুনরায় খেলেন এবং বারাঙ্গনা পুনরায় দিল; তিনিও পুনরায় খেলেন।

এইভাবে কিছুদিন মোহনভোগ খেতে খেতে সাধুর শরীরে কিছু বল সঞ্চার হলে সাধু তাঁর দুচোখ খুলে গাছ থেকে নেমে বারাঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি? কি জন্য একা একা এই নির্জন বনে প্রবেশ করেছ?'

সে উত্তরে বললো, 'আমি দেবকন্যা, দেবলোকে তপস্যা করি আমি তীর্থ করতে বেড়িয়ে পরম পবিত্র ভারতবর্ষে এসে যোগাভ্যাস-' বাসনায় কাছেই এক আশ্রম নির্মাণ করেছি। আমি সেখানেই থাকি। সৌভাগ্যক্রমে এই আশ্রমে প্রবেশ করে আপনার সেবা করে ধন্য হলাম।'

সাধু বললেন, 'আমি তোমার সৌজন্য ও নম্র স্বভাব দেখে এবং তোমার সুন্দর মূর্তি দর্শনে আনন্দিত হয়েছি, যা হোক, তোমার আশ্রম দেখবার জন্য আমার ইচ্ছা হয়েছে। যদি কোন বাঁধা না থাকে আর বেশী দূর না হয় তাহলে আমায় সেইখানে নিয়ে চল।'

বারাঙ্গনা সাধুর কথা শুনে তাঁকে নিজের গৃহে নিয়ে গেল এবং যত্ন করে সুস্বাদু মিষ্টি পানীয় দিল। তিনি বারাঙ্গনার মিথ্যাজালে রুদ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করলেন। এইভাবে সাধু যোগাভ্যাস ত্যাগ করে বারাঙ্গনার সাথে বিষয়বাসনায় দিন কাটাতে লাগলেন। তারপর বারাঙ্গনা একটি পুত্র লাভ করল। কিছুদিন পর বারাঙ্গনা সন্ন্যাসীকে বললো, 'প্রভু! বহুদিন পার হল, আমরা কেবল বিষয়বাসনায় দিন কাটালাম, এখন তীর্থযাত্রা করে দেহ পবিত্র করা উচিত।

তারপর বারবণিতা প্রবঞ্চনার দ্বারা সাধুকে অজ্ঞান করে তাঁর কাঁধে পুত্রকে দিয়ে চন্দ্রভানুর রাজধানীতে নিয়ে চললে। সে রাজসভার কাছে গেলে, রাজা তাঁকে চিনতে পেরে এবং সন্ন্যাসীর কাঁধে পুত্র দেখে, রাজসভায় উপস্থিত সকলকে বললেন, 'দেখ দেখ যে বারনারী সাধুকে আনার প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিল, সে নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে ফিরে আসছে। আমি বারনারীর বুদ্ধি-কৌশলে চমৎকৃত হয়েছি, বেশী আর কী বলব, এই বুদ্ধিমতী বারবণিতা চিরশুষ্ক নীরস গাছকেও ফুলে ফলে পূর্ণ করেছে।'

সভাস্থ সকলে বললেন, 'মহারাজ ঠিকই বলেছেন, এ সেই বারাঙ্গনাই বটে।'

রাজা ও সভাসদদের এইরূপ কথোপকথন শুনে সাধুর চৈতন্যদোয় হল এবং মোহ কেটে গেল। তখন সন্ন্যাসী পূর্বের সব কথা মনে মনে আলোচনা করে রাগে জ্বলতে লাগলেন এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, দুরাত্মা চন্দ্রভানু ঐশ্বর্যমদে মত্ত ও ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য হয়ে আমার তপস্যা ভাঙ্গার জন্য এক মায়াজাল বিস্তার করেছিল। আমিও অতি অধম, অনায়াসে বারাঙ্গনার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে চিরদিনের সঞ্চিত কর্মফল থেকে বিতারিত হলাম। তারপর প্রচণ্ড রাগে কাঁধের পুত্রটিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। তারপর অন্য এক বনে গিয়ে আগের থেকে আরও মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে তপস্যা করতে লাগলেন এবং কিছুদিন পর রাজা চন্দ্রভানুকে হত্যা করে কৃতকার্য হলেন।

এই আখ্যায়িকা শেষ করে যক্ষ বললো, 'মহারাজ! তুমি ও রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ যোগী এই তিনজন, এক নগরে এক নক্ষত্রে, এক লগ্নে জন্মেছিলে, তুমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে রাজত্ব করছ, চন্দ্রভানু তেলীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে ভোগবতী নগরীর রাজা হয়েছে, আর যোগী কুমোরের ঘরে জন্মে যত্নসহকারে যোগসাধনা করে নানা ক্ষমতা অর্জন করেছে। এই কুমোর চন্দ্রভানুকে হত্যা করে তাঁকে বেতাল করে শ্মশানের নিকটবর্তী এক শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে, এখন তোমাকে হত্যা করার চেষ্টায় আছে, এতে সিদ্ধ হলে তাঁর সংকল্প পূর্ণ হয়। যদি তুমি তার হাত থেকে নিস্তার পাও, তবে বহুদিন বিনা বাধায় রাজ্য ভোগ করতে পারবে। আমি সব কথা বলে সাবধান করে দিলাম। তোমার এ বিষয়ে সবকিছুই জানা আছে অতএব সাবধান হও।' এই বলে যক্ষ তার নিজের জায়গায় চলে গেল।

রাজাও শুনে ভীত ও বিস্মিত হয়ে নানা কথা চিন্তা করতে করতে নিজের প্রাসাদে এসে পৌঁছলেন।

পরদিন সকালে তিনি সিংহাসনে বসলে সভাসদ ও প্রজারা বহুদিন পর তাদের রাজাকে দেখে আনন্দে মগ্ন হল। রাজা বিক্রমাদিত্য সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী শ্রীফল হাতে রাজ-সভায় এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজাকে আশীর্বাদ করে একটি ফল দিলেন; তারপর ঘরে আসন পেতে তার উপর বসলেন! কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্ন্যাসী সভা থেকে চলে গেলেন। তখন রাজা নিজের মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা বলেছিল এ সে কিনা। যা হোক, হঠাৎ শ্রীফল খাওয়া উচিত না। রাজা মনে মনে এই কথা চিন্তা করে কোষাধ্যক্ষের হাতে শ্রীফলটি দিয়ে বললেন, তুমি এই শ্রীফলটি সাবধানে রাখবে।'

সন্ন্যাসী প্রতিদিন রাজদর্শনে এসে একটি করে শ্রীফল দিতে লাগলেন।

একদিন রাজা বয়স্যদের সাথে অশ্বশালা পরিদর্শন করছেন এমন সময় সন্ন্যাসীও সেখানে উপস্থিত হয়ে আগের মত যখন ফল দিতে গেছেন তখন ফলটি রাজার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে ফেটে গেল এবং তার মধ্য থেকে এক অপূর্ব রত্ন বের হল। রাজা ও বয়স্যগণ তা দেখে খুব চমকে গেলেন। রাজা সাধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আপনি কি জন্য এই রত্নগর্ভ ফল দিলেন।

সাধু বললেন. 'মহারাজ! শাস্ত্রে আছে, রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসকের কাছে খালি হাতে যেতে নেই; এইজন্য আমি এই রত্নগর্ভ শ্রীফল নিয়ে এসেছিলাম। আর এই ফলটির মধ্যেই যে শুধু রত্ন আছে তা নয়, আমি আপনাকে প্রতিদিন যে ফলগুলো দিয়েছি তার প্রত্যেকটির মধ্যে এই রত্ন আছে।'

রাজা তখন কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, 'তোমাকে আমি যত-গুলি শ্রীফল দিয়েছি তা এখানে উপস্থিত কর।'

কোষাধ্যক্ষ রাজার আদেশ অনুসারে সমস্ত শ্রীফল সেখানে নিয়ে গেলে রাজা প্রত্যেকটি ফল ভেঙ্গে দেখলেন প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি করে রত্ন আছে ; এই দেখে রাজা আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হলেন এবং রাজসভায় গিয়ে এক মণিকারকে ডেকে ঐ সমস্ত রত্নগুলি পরীক্ষা করার আদেশ দিয়ে বললেন, প্রত্যেকটি রত্নের মূল্য কত হবে ঠিক করে দাও।'

রাজার এই কথা শুনে মণিকার প্রত্যেকটি রত্নের লক্ষণ পরীক্ষা করে বললো, মহারাজ ! নির্ভুল বিবেচনা করে দেখলাম সব কয়টি রত্নই সর্বাঙ্গ সুন্দর ; প্রতিটির মূল্য কোটিরও বেশী অর্থাৎ এ সকলই অমূল্য রত্ন।

রাজা শুনে খুব আনন্দিত হলেন এবং কিছু পারিতোষিক দিয়ে মণিকারকে বিদায় করলেন। তারপর তিনি সন্ন্যাসীর হাত ধরে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, 'প্রভু ! আমার সাম্রাজ্যও আপনার ঐ রত্নগুলির সমান দাম হবে না, আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এই সব অমূল্য রত্ন-কোথায় পেলেন, এবং কি জন্যই বা এই সকল রত্ন আমার হাতে দিলেন, তা জানতে ইচ্ছা করছে।

সন্ন্যাসী বললেন 'মহারাজ ! ঔষধ আর মন্ত্রণা সবার সামনে বলা ঠিক নয় ; যদি অনুমতি করেন নির্জনে গিয়ে বলি। নীতিজ্ঞেরা বলেন—মন্ত্রণা অন্য কানে গেলে তা অপ্রকাশিত থাকে না। তাতে কার্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। চারজন জানতে পারলে জানাজানি হয় কিন্তু কার্যসিদ্ধ হয় না, আর দুইজনের কথা মানুষ তো দূরের কথা স্বয়ং ব্রহ্মাও জানতে পারেন না।'

এই কথা শুনে রাজা সন্ন্যাসীকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে যোগীশ্বর ! আপনি আমায় এত রত্ন দিলেন, কিন্তু একদিনও আমার বাড়ীতে খেলেন না, এ জন্য আমি আপনার কাছে খুব লজ্জিত হচ্ছি। আপনার যদি কিছু বলার থাকে তবে তা বলুন ; আমি প্রাণ দিয়েও তা রক্ষা করব।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'মহারাজ! গোদাবরীর তীরে এক শ্মশানে আমি মন্ত্রসিদ্ধ করব বলে ঠিক করেছি, তাতে আমার অনেক ক্ষমতা লাভ হবে। অতএব তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই, তুমি একদিন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আমার কাছে থাকবে। তুমি কাছে থাকলেই আমার মন্ত্রসিদ্ধ হবে।'

রাজা বললেন, 'নিশ্চয় যাব ; আপনি দিন ঠিক করে দিন।

সন্ন্যাসী বললেন 'তুমি আগামী ভাদ্রকৃষ্ণাচতুর্দশীতে সন্ধ্যাবেলায় একা আমার কাছে যাবে।'

রাজা বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন ; আমি নিঃসন্দেহে ঠিক সময়ে আপনার আশ্রমে পৌঁছব।'

রাজাকে এইভাবে কথায় বদ্ধ করে বিদায় নিয়ে সন্ন্যাসীর নিজস্ব আশ্রমে ফিরে গেলেন।

কৃষ্ণাচতুর্দশী। সন্ন্যাসী সন্ধ্যাকালে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদী নিয়ে শ্মশানে যোগাসনে উপবিষ্ট। বীর কেশরী রাজা বিক্রমাদিত্য কটি দেশে তরবারি নিয়ে একাকী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপনীত হলেন। দেখলেন সেই মহাশ্মশানে ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্কিনী, ডাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি পিশাচ পিশাচী উন্মত হয়ে সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করে মহোল্লাসে নিত্য করছে। সন্ন্যাসী যোগাসনে—দুই হস্তে নরক পাল নিয়ে বাদ্য করছেন। এইসব পৈশাচিক দৃশ্যে রাজা বিন্দুমাত্র শঙ্কিত হলেন না। উপরন্তু তিনি যোগীশ্বরকে প্রণাম করে জোড় হস্তে বললেন—দেব! দীন উপস্থিত। আদেশ করুণ! যোগীবর হস্ত উত্তলন করে আশীর্বাদ জানিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশে বসবার আসন দেখিয়ে দিলেন।

রাজা যোগীবরের আদেশে উপবিষ্ট হয়ে বললেন এখন অধমের প্রতি কি আদেশ হয় বলুন। যোগীবর বললেন—আমি তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। বুঝলাম সৎপুরুষ যাঁরা তাঁরা প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ হন না। যাই হোক যখন এসেছ তখন আমায় একটু সাহায্য করতে হবে, এখান হতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে একটা

শ্মশান আছে। সেখানে গিয়ে দেখতে পাবে শিরীষ বৃক্ষে একটা শব ঝুলছে, সেই শবটি আমার নিকট আনতে হবে। রাজা 'যথা আজ্ঞা' বলে চলে গেলেন। যোগীবর রাজাকে পাঠিয়ে পূজায় বসলেন। একে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি। বিশ্বজগৎ ঘোর অন্ধকারে ভরা। তার উপর মেঘের ঘনঘটায় আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে মুষল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই ভয়ানক রাত্রিতে ভূত প্রেতগণের চারিদিকে তাণ্ডব নৃত্য! এই ভীষণ দুর্যোগে অতি বড় বীরের হৃদয়ও চঞ্চল হয়। কিন্তু রাজার বিন্দুমাত্রও ভীতির সঞ্চার হল না—তিনি এই সকল সঙ্কট হতে উত্তীর্ণ হয়ে নির্দিষ্ট শশ্মান—ভূমিতে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন কোথাও অতি বিরাট মূর্তি ভূত প্রেতগণ জীবন্ত মানুষকে ধরে তাদের মাংস ভক্ষণ করছে, কোথাও বা ডাকিনী ছোট ছোট বালকের দল ধরে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চর্বন করছে। কি বীভৎস সে দৃশ্য! রাজা নির্ভীক চিত্তে সে সকল উপেক্ষা করে বহু অন্বেষণে শিরীষ বৃক্ষের নিকটে গিয়ে দেখলেন—গাছটির মূল হতে অগ্রভাগ পর্যন্ত শাখা প্রশাখা ও পল্লব ধক্ ধক্ করে জ্বলছে—আর চতুর্দিকে মার মার কাট কাট অবিরল হুঙ্কার ধ্বনি!

রাজা নির্ভীক, তিনি বৃক্ষের নিকটে গিয়ে দেখলেন শবটি রজ্জুবদ্ধ, অধঃশিরে লম্বিত। শবটার যে সন্ধান মিলেছে রাজা সেই আনন্দে আত্মহারা। নির্ভয়ে বৃক্ষের উপর উঠে খড়্গাঘাতে শবের রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করলেন! শবটি মাটিতে পড়বামাত্র উচ্চরোলে রোদন করতে লাগল! রাজা শবের চীৎকারে আশ্চর্য্য হয়ে তাড়াতাড়ি বৃক্ষ হতে নেমে এসে শবকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? কেন তোমার এই বীভৎস অবস্থা? শব তখন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। রাজা এই সব দেখে শুনে চমকিত হয়ে এই অদ্ভুত ঘটনার নানা কল্পনা করতে লাগলেন। এই অবকাশে শবটি পুনরায় বৃক্ষের উপরে উঠে রজ্জুবদ্ধ ও লম্ববান হয়ে রইল। রাজাও বিলম্ব না করে পুনরায় বৃক্ষে উঠে রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করে শবটাকে স্কন্ধে নিয়ে নীচে নেমে



"শব তখন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল"—পৃষ্ঠা ১৫

পড়লেন—এবং তার এই দুর্দশার কারণ জিজ্ঞসা করলেন। শব কোন উত্তর দিল না। রাজার মনে হল যক্ষের নিকট যে তৈলিকের কথা শুনেছিলাম এসে ভিন্ন আর কেউ নয়, আর যোগীও সেই কুম্ভকার, আপনার যোগ সিদ্ধির জন্য এর প্রাণ সংহার করে শ্মশানে রেখেছে। তারপর রাজা শবকে উত্তরীর বস্ত্রে বন্ধন করে যোগীশ্বরের কাছে চললেন। রাজা অর্ধপথে অতিক্রম করেছেন, এমন সময় শবাবিষ্ট বেতাল রাজাকে জিজ্ঞাসা করল—ওহে বীরপুরুষ তুমি কে? কি জন্য কোথায় আমাকে নিয়ে চলেছে? রাজা বললেন—আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল যোগীর আদেশে তোমাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছি। তখন বেতাল বললে মহারাজ! মূঢ় নির্বোধ ও অলসেরা কেবল নিদ্রায় আলস্যে ও বিসম্বাদে সময় অতিবাহিত করে। আর যাঁরা বুদ্ধিমান চতুর পণ্ডিত তাঁরা সদ্ আলাপন, শাস্ত্র চিন্তা ও সৎ কর্মে আনন্দে দিন যাপন করেন। আমার কথা এই যে এতখানি পথ নির্বাকে অতিক্রম অপেক্ষা সদ্ কথাবার্তায় পথ অতিক্রম করা যুক্তিযুক্ত। আমি এক একটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করছি শোন। প্রত্যেক প্রসঙ্গের সমাপ্তিতে প্রশ্ন করব। যদি তুমি সেই প্রসঙ্গের সঠিক উত্তর দাও তৎক্ষণাৎ ফিরে যাব। আর জানা সত্বেও যদি তার উত্তর না দাও তাহলে সেইক্ষণে তোমার বক্ষঃস্থল বিদার্ণ হবে। রাজা বেতালের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বেতালও উপাখ্যান আরম্ভ করল—



প্রথম উপাখ্যান

বেতাল বলল, মহারাজ শ্রবণ কর, সেকালে বারানসী নগরে প্রতাপমুকুট নামে এক পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর মহিষীর নাম মহাদেবী। বজ্রমুকুট নামে তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি ছিল তাঁদের চোখের মণি।

একদিন রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে মৃগয়ায় গেলেন। তিনি নানা বন ঘুরে একসময় নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেই অরণ্যের মধ্যস্থলে এক মনোহর সরোবর ছিল। তাঁরা সেখানে পৌঁছে দেখলেন সরোবরে নির্মল সলিলে হাঁস, বক এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীরা জলে মহানন্দে খেলা করছে। মধুকরেরা মধুগন্ধে আপন হারা হয়ে গুণ গুণ শব্দে চারিদিকে গুঞ্জন করছে। তীরে ফুল, ফল ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর গাছ রয়েছে, তাতে কোকিল ও অন্যান্য পাখিরা গান গাইছে। মিষ্টি বাতাস ও গাছের শীতল ছায়ায় বসলেই ঘুম এসে যায়। বড় সুন্দর জায়গা। এই সুন্দর জায়গায় কিছুক্ষণ পর রাজকুমার ঘোড়া থেকে নেমে তীরের বকুল গাছের সাথে ঘোড়াটা বেঁধে সরোবরে স্নান করলেন ; তারপর কাছেই শিবমন্দির দেখে ঠাকুর দর্শন করে পূজা করতে বসলেন। তারপর পূজা সেরে প্রণাম করে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে।

এই সময় এক রাজকন্যাও তার সহচরীগণকে নিয়ে সরোবরের

অন্য পাড়ে উপস্থিত হয়ে স্নান ও পূজা শেষ করে গাছের ছায়ায় বেড়াতে লাগলেন। রাজকুমার বজ্রমুকুট রাজনন্দিনীর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। রাজকুমারীও তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজের খোঁপা থেকে একটি পদ্মফুল খুলে হাতে নিলেন। তারপর ফুলটি কানে পরলেন, তারপর কান থেকে খুলে দাঁতে কাটলেন; তারপর মাটিতে ফেলে দিলেন এবং যাবার সময় ফুলটি কুড়িয়ে নিজের বুকে রাখলেন। তারপর রাজকুমারের দিকে তাকাতে তাকাতে নিজের সখীদের সাথে চলে গেলেন।

রাজকুমার এর কোন মানে বুঝলেন না। কিন্তু রাজকুমারীকে তাঁর বড়ই ভাল লাগল। তারপর তাঁর বন্ধু মন্ত্রীপুত্রের সাথে দেখা হতে তাঁকে সব বললেন। সব শুনে মন্ত্রীপুত্র বজ্রমুকুটকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

রাজকুমার প্রাসাদে ফিরে আগের মত কাজকর্ম, শাস্ত্রচিন্তা, আমোদ-প্রমোদ,স্নান,খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি আবশ্যিক কাজ সব ত্যাগ করে নীরবে একা একা কালযাপন করতে লাগলেন। সব সময় ঐ রাজকন্যার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যেতে লাগল। শেষে কোন উপায় না দেখে তিনি ঐ রাজকন্যার একটি ছবি আঁকলেন, এবং দিন রাত কেবল ঐ ছবিই দেখেন। কারও সাথে কথা বলেন না, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন না।

রাজকুমারের এই অবস্থা দেখে মন্ত্রীপুত্রের বড়ই ভাবনা হল!

একদিন রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে বললেন, বন্ধু! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি ঐ রাজকন্যাকে বিয়ে না করতে পারলে প্রাণ ত্যাগ করব।

মন্ত্রীপুত্র তখন অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, বন্ধু, ঐ রাজকন্যা কি চলে যাবার সময় তোমাকে কিছু বলেছে?

বজ্রমুকুট বললেন, না, আমাকে কিছুই বলেননি, কিন্তু পদ্মফুল দিয়ে একটি সঙ্কেত দেখিয়েছিলেন। এরপর রাজকুমার পদ্মফুলের

ঘটনাটি বললেন।

শুনে মন্ত্রীপুত্র খুশি হয়ে বললেন, তাহলে তো সব জানাই গেল!

তখন রাজপুত্র চঞ্চল হয়ে বললেন, কি করে তার নাম ধাম জানলে বলত, তাহলে একটু স্বস্তি পাই?

তখন মন্ত্রীপুত্র বললেন, বন্ধু শোন, মাথা থেকে ফুল নিয়ে কানে পরার মানে উনি কর্ণাট নগরে থাকেন, দাঁতে ফুল কাটার মানে উনি দন্তকাট রাজার মেয়ে। মাটিতে ফুল ছুঁড়ে ফেলার মানে ওঁর নাম পদ্মাবতী। আর বুকে তুলে নেওয়ার মানে উনি তোমাকে বিয়ে করতে চান।

বন্ধুর এই কথা শুনে রাজকুমারের মনে খুব আনন্দ হল এবং বারবার বলতে লাগলেন, বন্ধু তুমি আমায় কর্ণাট নগরে নিয়ে চল।

তখন তাঁরা দুজনে রাজকীয় পোশাক পরে, উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চেপে কর্ণাট নগরের দিকে রওনা হলেন।

নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা কর্ণাট নগরে পৌঁছে রাজবাড়ির সামনে গিয়ে দেখলেন একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর এবং তাতে একটি বুড়ি বসে আছে। তখন তাঁরা ঘোড়া থেকে নেমে বুড়িকে বললেন, মা! আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি, একটু থাকবার জায়গা দিতে পার?

বুড়ি তাদের সুন্দর চেহারা ও মিষ্টি কথা শুনে বললো, বাছা! এ তোমাদেরই বাড়ি, যতদিন খুশি থাকতে পার।

তখন দুজনে বুড়ির ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর বুড়ি এসে তাদের সামনে বসে গল্প করতে লাগল। তখন মন্ত্রীপুত্র জিজ্ঞাস করলেন, মা! ক'জন তোমাদের এই বাড়িতে থাকে? আর কি করেই বা তোমার সংসার চলে?

তখন বুড়ি বললো, আমার ছেলে রাজবাড়িতে কাজকর্ম করে এবং রাজার অতি প্রিয় পাত্র। আর পদ্মাবতী নামে রাজার এক মেয়ে আছেন আমি তাঁর ধাইমা ছিলাম। এখন বৃদ্ধ হয়েছি তাই বাড়িতে থাকি, রাজা অনুগ্রহ করে আমায় অন্ন ও বস্ত্র দেন। আর,

রাজকন্যা আমায় ভালবাসেন, এজন্য আমি প্রতিদিন তাঁকে একবার করে দেখতে যাই।

এই কথা শুনে রাজকুমার বললেন, তুমি কাল গিয়ে রাজকন্যাকে বলবে, শুক্লাপঞ্চমীতে সরোবরের তীরে যে রাজকুমারকে দেখেছিলেন সে তাঁর সংকেত বুঝে এখানে এসেছে।

এই কথা শুনে বুড়ি বললো, কাল কেন? আমি এখনই রওনা হলাম।

এই বলে বুড়ি লাঠি হাতে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে রওনা দিল। সে গিয়ে রাজকন্যাকে দেখল একা বসে আছেন আর কি যেন ভাবছেন। রাজকন্যা বুড়িকে দেখামাত্র বসার আসন দিলেন।

বুড়ি বসে বললো, বাছা, ছোটবেলা থেকে তোমায় অনেক যত্নে মানুষ করেছি। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি কোন ভাল ছেলেকে বিয়ে কর। শুক্লা পঞ্চমীতে সরোবরের তীরে তুমি যে রাজকুমারকে দেখেছিলে. তিনি এখন আমার বাড়ীতে আছেন। তিনি তোমাকে আমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। এই রাজকুমার রূপে গুণে সব বিষয়ে তোমার উপযুক্ত। তুমি তাঁর যোগ্য পাত্রী।

এই কথা শুনে রাজকন্যা রেগে দুই গালে চড় মেরে বুড়িকে বললেন, তুমি এই মুহূর্তে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

বুড়িটি এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে রেগে চলে গিয়ে রাজকুমারকে সে সব বললো।

শুনে রাজকুমার হতাশ হয়ে মন্ত্রীপুত্রকে বললেন, বন্ধু কোন আশা দেখছি না।

কিন্তু মন্ত্রীপুত্র বললেন, কোন ভয় পেয়ো না, অত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই, গালে দশটি আঙুলের ছাপ মানে দশদিন পরে শুক্লপক্ষের শেষে তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

শুক্লপক্ষ এল। বুড়ি আবার রাজকুমারীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করল। রাজকুমারী শুনে এবার অন্দরমহলের খিড়কী-দরজা দিয়ে

তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন। সে তখন রাজকুমারের কাছে গিয়ে এই কথা বললো। সব শুনে রাজকুমার হতাশ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

তখন মন্ত্রীপুত্র বললেন, বন্ধু, কেন অত ভেঙে পড়ছ, আর কোন ভাবনা নেই, রাজকুমারী আজ রাতে তোমাকে খিড়কী-দরজা দিয়ে অন্দরে যেতে বলেছেন।

শুনে রাজকুমারের আনন্দের আর সীমা রইল না এবং সূর্য-ডোবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাত ঘনিয়ে এল। রাজকুমার ভাল জামাকাপড় পরে তৈরী হলেন, মন্ত্রীপুত্র তাঁকে খিড়কী-দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে এলেন এবং রাজকুমার ভিতরে গেলেন। দেখলেন রাজকুমারী তাঁর জন্য সেজেগুজে অপেক্ষা করছেন। রাজকুমারীর আদেশে সখীরা ঘরদোর ভাল করে সাজিয়ে রেখেছিল। তাদের সামনে সেই রাতে গন্ধর্ব মতে দুজনের বিয়ে হল। আনন্দে রাত কাটাল। সকালে রাজকুমার যখন অন্দরমহল থেকে চলে যাবেন তখন রাজকুমারী তাঁকে কিছুতেই ছাড়লেন না। রাজকুমার তাঁর কথা মত সেখানেই রয়ে গেলেন এবং সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এইভাবে কিছুদিন কাটানোর পর রাজকুমার নিজের দেশে ফিরতে চাইলেন। তখনও রাজকুমারী তাঁকে যেতে দিলেন না। এইভাবে একমাস কেটে গেল। রাজকুমারী তবু তাঁকে আপন দেশে ফিরে যেতে দিলেন না।

একদিন রাজকুমার নির্জনে বসে ভাবতে লাগলেন, আমি নিতান্তই অধম, আমি আমার পিতামাতার জন্মভূমি হারালাম। আর যে বন্ধুর বুদ্ধির জন্য আমি এই সুখ লাভ করছি তাকেও ভুলে গেলাম, সে হয়ত আমাকে স্বার্থপর ভাবছে।

রাজকুমার এইভাবে যখন একা একা বসে চিন্তা করছেন তখন রাজকুমারী সেখানে এসে তাঁকে বিষণ্ণ দেখে বললেন, তোমার কী

হয়েছে, তখন থেকে কী চিন্তা করছ বল ত ?

তখন রাজকুমার বললেন, বাবার মন্ত্রীপুত্র আমার সাথে এসেছে। সে আমার পরম বন্ধু। একমাস হল তার কোন খবর পাই না। জানি না সে কেমন আছে! সে খুব চালাক ও বিদ্বান, সেই তোমার সব সঙ্কেতের মানে আমায় বলেছিল।

রাজকুমারী পদ্মাবতী বললেন, তুমি খুব অন্যায় করেছ। বন্ধু প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর! আমি নানা রকম মিষ্টি তৈরি করে এখনি তার কাছে পাঠাচ্ছি এবং ততক্ষণ তুমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এস!

রাজকুমার তখনি খিড়কী-দরজা দিয়ে বেরিয়ে বুড়ির কুটিরে উপস্থিত হলেন এবং বহুদিনের পর বন্ধুকে দেখে তাঁর চোখে জল এল এবং তাঁর সব সৌভাগ্যের কথা বললেন।

রাজপুত্র যখন বন্ধুকে দেখতে গেলেন তখন রাজকুমারী মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, এ কেবল বন্ধুর কৌশলেই আমাকে বিয়ে করেছে। দুই বন্ধু দুজনকে সব কথা বলবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইভাবে সবাই এটা জানতে পারবে। অতএব মন্ত্রীপুত্রকে জীবিত রাখা ঠিক হবে না। এই সিদ্ধান্ত করে পদ্মাবতী নানা মিষ্টি তৈরি করে তাতে বিষ মিশিয়ে সখীকে দিয়ে রাজকুমারের হাতে পোঁছে দিলেন।

রাজকুমারীর সখী মিষ্টি দিয়ে গেলে মন্ত্রীপুত্র অবাক হয়ে তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, এ সব কী?

রাজপুত্র বললেন, বন্ধু আজ আমি তোমার কথা চিন্তা করছিলাম, পদ্মাবতী আমার দিকে তাকিয়ে এর কারণ জিজ্ঞসা করলে আমি তোমার প্রশংসা করে বললাম, যে আমি তোমায় না দেখতে পেয়ে চিন্তা করছি। পদ্মাবতী তোমার পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে, এবং আমাকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের হাতে এই সমস্ত তৈরী করে তোমার জন্য পাঠিয়ে আমায় বলেছে তুমি নিজে সামনে থেকে তাকে

মিষ্টি খাইয়ে আসবে। অতএব বন্ধু তুমি কিছু খাও, তাহলে শান্তি পাই এবং যেয়ে তাকে বলতে পারি আমার বন্ধু মিষ্টি খেয়ে তোমার প্রশংসা করেছে।

এইসব শুনে মন্ত্রীপুত্র তখন বড় দুঃখের সাথে বললেন, কিন্তু এই মিষ্টিতে বিষ আছে। যে খাবে সেই মরে যাবে, ভাগ্য ভাল তুমি এই মিষ্টি খাওনি। তোমার অত্যন্ত কোমল স্বভাব তাই তুমি কার কী স্বভাব বোঝ না। তোমায় একটা ভাল কথা বলি শোন, রাজকুমারীরা সাধারণত বিবাহিত রাজপুত্রের প্রিয়পাত্রকে দুচোক্ষে দেখতে পারে না। অতএব তুমি তার কাছে আমার পরিচয় দিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দাওনি।

রাজকুমার বললেন, বন্ধু, আমি তোমার একথা বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি তার স্বভাব জান না, এজন্য এ কথা বলছ। তার মত সহৃদয়া স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখনি। আমি আর তার সখী-গণের সাক্ষীতে আমাদের বিয়ে হয়। তুমি কী করে একথা মুখে আনলে? বেশ, তবে পরীক্ষা হয়ে যাক। তখন রাজকুমার সেই খাবার থেকে একটা মিষ্টি বুড়ির পোষ বিড়ালকে খেতে দিলেন খাবার সাথে সাথে বিড়ালটি মারা গেল!

তখন রাজকুমার একদম ভেঙে পড়লেন এবং বললেন, এই পাপিষ্ঠার সাথে কোন সম্পর্ক রাখা উচিত না। আমি আর ওর মুখ দেখব না।

মন্ত্রীপুত্র বললেন, তাকে একেবারে পরিত্যাগ করা উচিৎ হবে না, তাকে কৌশলে রাজধানীতে নিয়ে যেতে হবে।

রাজপুত্র বললেন, তোমার বুদ্ধিতেই এ কাজ সম্ভব হতে পারে।

মন্ত্রীপুত্র বললেন, তুমি বরং গিয়ে পদ্মাবতীকে বল যে মিষ্টি খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাকে কিছুই জানতে দিও না! তারপর রোজকার মত আজ যখন সে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বে তখন তুমি তাঁর গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে নিয়ে

একটা পুঁটলি বাঁধবে তারপর তাঁর বাঁ পায়ে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়ে চলে আসবে ?

রাজকুমার এতে রাজী হয়ে গেলেন এবং পদ্মাবতীর কাছে গিয়ে মন্ত্রীপুত্র যা বলতে বলেছিলেন তাই বললেন। শুনে রাজকুমারী খুশি হলেন। রাত হলে রাজকুমারী যখন ঘুমিয়ে পড়লেন রাজকুমার তখন মন্ত্রীপুত্রের কথা মত সব কাজ শেষ করে বুড়ির কুটিরে উপস্থিত হলেন।

পরদিন ভোরে মন্ত্রীপুত্র সন্ন্যাসী সেজে এক শ্মশানে গেলেন এবং গুরু হয়ে রাজপুত্রকে শিষ্য করে বললেন, তুমি রাজবাড়ির কাছে কোন স্যাকরার কাছে এগুলো বিক্রী কর। যদি কেউ রাজকুমারীর গয়না চিনতে পেরে চোর বলে তোমায় ধরে তাহলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

তখন রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রের কথামত রাজবাড়ির নিকট এক স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে এগুলো বিক্রী করতে গেলে স্বর্ণকার এগুলো দেখামাত্র চমকে উঠলো এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো যে কিছুদিন আগে আমি এই গয়নাগুলো রাজকুমারীকে তৈরি করে দিয়েছি ; এগুলো এর হাতে কি করে এল। তখন সে তার কারিগরদের জিজ্ঞাসা করতে তারাও বললো, হ্যাঁ, এগুলো রাজকুমারীর অলঙ্কার, কিছুদিন আগে আমরা এগুলো তৈরি করে দিয়েছি।

তখন সে রাজকুমারকে চোর মনে করে বললো, এসব রাজকুমারীর গয়না তুমি কী করে পেলে ?

বারবার এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে রাজপথের বহুলোক সেখানে এসে স্বর্ণকার ও রাজকুমারকে বন্দী করলে তখন রাজকুমার বললেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমার গুরুদেব শ্মশানে থাকেন, তিনি আমায় এসব বেঁচে দিতে বলেছেন, চলুন তাঁর কাছে, তিনি কী করে এসব পেয়েছেন আমি তাঁর কিছুই জানি না।

তখন নগররক্ষক শ্মশানে গিয়ে গুরু ও শিষ্যকে বন্দী করে রাজার

কাছে নিয়ে গেলেন।

রাজা এই গয়না দেখে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী মন্ত্রীপুত্রকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললেন, এসব তুমি কোথায় পেলে ?

তখন সন্ন্যাসী বললেন, আমি কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাতে নগরের শেষে ঐ শ্মশানে ডাকিনী মন্ত্র সিদ্ধ করছিলাম। মন্ত্রের প্রভাবে এক ডাকিনী এসে তার গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে দিয়ে গেছে এবং আমি তার বাঁ পায়ে যোগসিদ্ধির প্রমাণ হিসাবে ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছি। এ সেই সমস্ত গয়না।

রাজা তখন অন্দরমহলে গিয়ে রাণীকে বললেন, দেখত পদ্মাবতীর বাঁ পায়ে কোন চিহ্ন আছে কিনা ?

তখন রাণী দেখে এসে বললেন যে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

এই কথা শুনে লজ্জায় রাগে ও দুঃখে অন্ধ হয়ে বললেন, এই পাপিষ্ঠাকে রাজবাড়িতে রাখা উচিত না, একে কী শাস্তি দেব? প্রাণদণ্ড না নির্বাসন ?

সন্ন্যাসী বললেন, মেয়ে ও বালকদের কখনও মেরে ফেলা উচিত না, আপনি পদ্মাবতীকে নির্বাসনদণ্ড দিন।

এই কথা শুনে রাজা অন্দরমহলে গিয়ে রাণীকে বললেন, পদ্মাবতী অতি পাপিষ্ঠা মেয়ে। এজন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে আমি ওকে আমার দেশের বাইরে বার করে দেব। ও থাকলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে ? তখন রাণীও আর নিষেধ করতে পারলেন না। তারপর রাজার হুকুমে পদ্মাবতীকে পাল্কী করে গভীর বনে রেখে আসা হল।

মন্ত্রীপুত্র তখন রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমারীর খোঁজে চললেন ; এবং অনেক খুঁজে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন পদ্মাবতী একা গাছের তলায় বসে ভয়ে ভাবনায় কাঁদছেন। অনেক কষ্টে তাঁকে শান্ত করে রাজকুমার ঘোড়ার পিঠে তুলে নিজের দেশের দিকে রওনা হলেন।

রাজা প্রতাপমুকুট ও রাণী অনেকদিন পর তাঁদের ছেলে ও বৌকে

দেখে আহ্লাদে আটখানা হলেন। রাজধানীতে আনন্দের ধুম পড়ে গেল।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল মহারাজ,—রাজা ও মন্ত্রীপুত্র উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিরপরাধিনী রাজনন্দিনীর নির্বাসনের জন্য বেশী দায়ী হলেন ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে রাজা দন্তবাট।

বেতাল বললো, কেন ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, কারণ শত্রুকে মারায় দোষ হয় না। পদ্মাবতী, মন্ত্রীপুত্রকে শত্রু ভেবে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছেন এবং মন্ত্রীপুত্র পদ্মাবতীকে শত্রু ভেবেছিলেন,তাই তার সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহারে তার কোন দোষ হয়নি। কিন্তু রাজা এক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করে কোন প্রমানাদি না নিয়ে অপত্যস্নেহ চির-জলাঞ্জলি দিয়ে কন্যাকে নির্বাসিতা করলেন। এতে তাঁর রাজধর্মের বিরুদ্ধকর্মের পাপী হতে হবে।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার শ্মশানে গিয়ে আগের মত গাছে ঝুলে পড়ল। বিক্রমাদিত্যও তার পিছনে পিছনে গিয়ে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে পুনরায় রওনা হলেন।



দ্বিতীয় উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ দ্বিতীয় উপাখ্যান আরম্ভ করছি শোন—

সেকালে যমুনানদীর তীরে জয়স্থল নামে এক গ্রাম ছিল। সেখানে কেশবশর্মা নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ঐ ব্রাহ্মণের এক ছেলে ও মধুমালতী নামে এক রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিল। ক্রমে মধুমালতীর বিয়ের বয়স হলে, ব্রাহ্মণ ও তাঁর ছেলে চারদিকে সুপাত্রের অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

একদিন ব্রাহ্মণ তার যজমানের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে গ্রামের সীমান্তে গেছেন; ব্রাহ্মণের পুত্রও গুরু গৃহে চলে গেলেন অধ্যয়ন করতে। তখন বাড়িতে শুধু মধুমালতী আর তার মা। এমন সময় ত্রিবিক্রম নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলে কেশবের বাড়িতে অতিথি হয়ে এলো। অতিথিটিকে দেখে ব্রাহ্মণীর জামাতা করবার ইচ্ছা হল। ব্রাহ্মণী যথোচিত ভাবে অতিথি সৎকার করে তার বংশ পরিচয় জেনে নিলেন। আরও জানলেন অতিথি বড় বংশের ছেলে। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন যদি এর সাথে মধুমালতীর বিয়ে হয় তাহলে খুব ভাল হয়। তখন তাকে বললেন, বৎস! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব। ব্রাহ্মণ নন্দন মধুমালতীর অপূর্ব রূপ ও লাবন্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণীর নিকট স্বীকৃত হলেন মধুমালতীকে বিয়ে করতে। এবং কেশবের আসার অপেক্ষায় রইল।

কিছুদিন পর ব্রাহ্মণ ও তাঁর ছেলে মধুমালতীর বিয়ে দেবার জন্য দুটি পাত্র সঙ্গে করে ফিরলেন। তাদের নাম বামন আর মধুসূদন। মোট তিনটি পাত্র হল, তিনটি পাত্রই রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অবস্থায় ও বংশমর্যাদায় সমান, কারুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তখন কেশব মহা বিপদে পড়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এক মেয়ের তিন পাত্র হাজির ; এখন কী উপায়। এমন সময় ব্রাহ্মণী এসে বললেন, ওগো, তুমি কি চিন্তা করছো ! এদিকে সাপের কামড়ে মধুমালতীর যে প্রাণ যায় !

তখন কেশব, দ্রুত চার পাঁচজন বিষ বৈদ্য ডেকে রীতিমত চিকিৎসা করালেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিষবৈদ্যরা বললেন, ঐ মেয়েকে আর বাঁচান গেল না, এখন যা কর্তব্য তাই করুন। আমরা চললাম। এই বলে বিষবৈদ্যরা চলে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে মধুমালতী মারা গেল। সকলে শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন কেশব, তাঁর ছেলে এবং পাত্র তিনটি তার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলল। কেশব ও তাঁর ছেলে বাড়ি ফিরে এসে শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

পাত্র তিনটি কিন্তু তখনি চলে গেল না। ত্রিবিক্রম নিভে যাওয়া চিতা থেকে হাড় কুড়িয়ে কাপড়ে বেঁধে ঘরের কোণে রেখে দিয়ে দেশ ঘুরতে বেরোল। বামন সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থে বেরোল। মধুসূদন ঐ শ্মশানের এককোণে পাতার কুঁড়েঘর বানিয়ে চিতা থেকে ছাইগুলো জড়ো করে যত্ন করে কুঁড়েঘরে এনে যোগাভ্যাস করতে লাগল।

এদিকে বামন ঘুরতে ঘুরতে দুপুরবেলা এক ব্রাহ্মণের বাড়ি পৌঁছাল। খাওয়ার সময় সন্ন্যাসী দেখে ব্রাহ্মণ তাকে আদর আপ্যায়ণ করে খেতে বসালেন। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করতে লাগলেন। এই সময় ব্রাহ্মণের পাঁচ বছরের ছেলে ব্রাহ্মণীকে জ্বালাতন করতে লাগল। ব্রাহ্মণী ছেলেকে নানাভাবে শান্ত করতে লাগলেন ; কিন্তু সে কোন কথা শুনল না। তখন ব্রাহ্মণী তিতবিরক্ত হয়ে ছেলেকে

জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণীর এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে সন্ন্যাসী 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে তখনি খাওয়ার পাত্র থেকে হাত তুলে নিলো। তাই দেখে ব্রাহ্মণ বললেন, কি হল ? খাওয়া বন্ধ করলেন কেন ?

সন্ন্যাসী বললো,যেখানে এই রকম রাক্ষুসীর মত মা আছে সেখানে খাই কি করে বলুন।

ব্রাহ্মণ তখন একটু হেসে ঘরে গিয়ে একটি সঞ্জীবনী পুঁথি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। পুঁথি খুলে একটি মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ছেলে প্রাণ ফিরে পেয়ে আবার জ্বালাতন শুরু করল।

সন্ন্যাসী চমকে উঠে খুশি মনে খাওয়া শেষ করলো এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো যে এই পুঁথিতে মৃতসঞ্জিবনীমন্ত্র আছে ; ঐ মন্ত্র জানতে পারলে, মধুমালতীকে আবার বাঁচিয়ে তোলা যাবে। অতএব যেকরেই হোক এটিকে চুরি করে নিতে হবে।

মনে মনে এই আলোচনা করে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে বললো, দুপুর ফুরিয়ে গেল, এখনই রাত হবে অতএব আর কোথাও না গিয়ে রাতটা আপনার বাড়িতেই থাকতে চাই।

ব্রাহ্মণ তাকে থাকার জায়গা ঠিক করে দিলেন। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে এল, সবাই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল, রাত গভীর হল, সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সন্ন্যাসী পাশের ঘর থেকে পুঁথিটা নিয়ে নিঃশব্দে সেই বাড়ি থেকে চলে গেলো।

কিছুদিন পর বামন জয়স্থল নগরের সেই শ্মশানে উপস্থিত হয়ে দেখলো মধুসূদন পাতার কুঠিরে বসে যোগাভ্যাস করছে। এমন সময় ত্রিবিক্রমও সেখানে উপস্থিত হল।

তিন পাত্র এক জায়গায় হলে বামন বললো, আমি মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্র শিখেছি ; তোমরা হাড় ও ছাই একসাথে কর, আমি মধুমালতীকে

বাঁচিয়ে তুলতে পারব। তারা ব্যস্ত হয়ে ছাই ও হাড় জড়ো করে দিলো। তখন বামন পুঁথি খুলে একটি মন্ত্র জপ করতে লাগলো। দেখতে দেখতে ছাই ও হাড়ের যায়গায় মধুমালতীর সুন্দর দেহ আবার জীবন্ত হয়ে উঠল। পাত্ররা মধুমালতীর সুন্দর রূপ দেখে আনন্দে অধীর হয়ে বলতে লাগল, আমি এই মেয়েকে বিয়ে করব, এই বলে তিন পাত্র নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে লাগল।

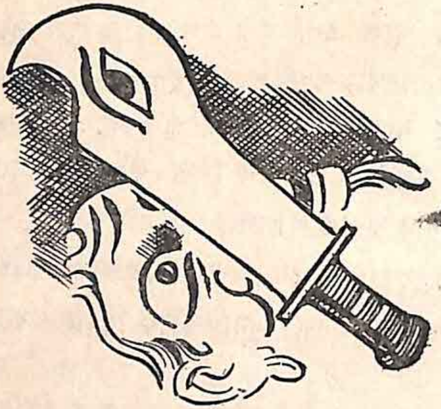
এই বলে গল্প শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল, বলত মহারাজ, এই তিনের মধ্যে কে মধুমালতীকে বিবাহ করতে পারে ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, যে শ্মশানে পর্ণ কুঠির নির্মান করে এতদিন শ্মশানবাসী হয়েছিল তারই এই রমণীর পানী গ্রহণে অধিকার।

বেতাল বললো, যদি ত্রিবিক্রম অস্থিগুলি সংগ্রহ করে না রাখত এবং বামন আর নানা দেশ পর্যটন করে মন্ত্রের শিক্ষা না করতো তবে কী করে মধুমালতী বেঁচে উঠত ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, ত্রিবিক্রম হাড় সংগ্রহ করে ছেলের কাজ করেছিল, বামন প্রাণ দিয়ে বাবার কাজ করেছিল। তাদের সঙ্গে মধুমালতার বিয়ে হতে পারে না। বাকী থাকে মধুস্দন। সে ছাই সংগ্রহ করে পর্ণ কুটির নির্মান করে শ্মশানবাসী হয়ে যথার্থই প্রণয়ীর কাজ করেছে সুতরাং তার সঙ্গেই মধুমালতীর বিয়ে হওয়া উচিত।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল শ্মশানে ফিরে গিয়ে আবার আগের মত গাছে ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্যও পেছন পেছন গিয়ে দড়ি কেটে তাকে পেড়ে এনে, কাঁধে তুলে, সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। বেতালও তৃতীয় গল্প আরম্ভ করল।



তৃতীয় উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ!

বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে অতি বিজ্ঞ, গুণগ্রাহী, দয়াশীল ও পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। দক্ষিণদেশ নিবাসী বীরবর নামে এক রাজপুত কর্মপ্রাপ্তির জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হল। রাজা তার আকার প্রকার দেখে স্থির করলেন যুবক কর্মদক্ষ বটে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বীরবর! কত বেতন পেলে, তোমার সচ্ছন্দে দিনপাত হতে পারে!

বীরবর বললো মহারাজ! রোজ এক হাজার সোনার মোহর পেলেই আমার চলে যাবে!

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমার সংসারে পরিজন কত?

বীরবর বললো, আমার স্ত্রী, এক ছেলে ও মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই।

রাজা শুনে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, এর পরিবার ছোট অথচ কি জন্য এত টাকা চায়! নিশ্চয় এর কোন অসাধারণ গুণ আছে অতএব কিছুদিন একে রেখে পরীক্ষা করা যাক। তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন সে যেন প্রতিদিন বীরবরকে এক হাজার সোনার মোহর বেতন হিসাবে দেয়।

বীরবর প্রতিদিন এক হাজার সোনার মোহর নিয়ে রাজা যে বাড়ি তাকে থাকবার জন্য দিয়েছেন সেই বাড়িতে যায়। বাড়ি গিয়ে মোহরের অর্ধেক বৈষ্ণব, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের দান করে। বাকী টাকা দিয়ে গরীব দুঃখী ও অনাথদের পেট ভরে খাইয়ে সামান্য নিজের সংসারে খরচ করে।

শুধু একদিন নয়, রোজ সে এইভাবে দিন কাটাতে লাগল। সারাদিন এইভাবে মোহর খরচ করে রাত্রে বীরবর অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ পোশাক পরে রাজবাড়ি পাহারা দিত। রাজা তার শক্তি ও প্রভু-ভক্তির পরীক্ষা করবার জন্যে—দ্বিতীয় প্রহর কি তৃতীয় প্রহরে নানা কঠিন কাজ করতে পাঠাতেন। অতি দুঃসাধ্য হলেও সে তখন গিয়ে সে কাজ সম্পন্ন করে আসত।

একদিন গভীর রাতে হঠাৎ স্ত্রীলোকের কান্না শুনতে পেয়ে রাজা বীরবরকে ডেকে বললেন, বীরবর! দক্ষিণদিক থেকে একজন স্ত্রীলোকের ভীষণ ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তুমি আমাকে শীঘ্রই জানাবে কেন এই অস্বাভাবিক ঘটনা। বীরবর রাজআজ্ঞা প্রতি-পালন করতে চলল। রাজাও বীরবরের শৌর্য্য বীর্য্য পরীক্ষার জন্য গোপনে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন।

বীরবর সেই রোদন ধ্বনি লক্ষ্য করে এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে গিয়ে দেখল এক পরমাসুন্দরী রমণী দামী বেশ-ভূষা অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে শিরে করাঘাত করে হাহাকার করে কাঁদছে। বীরবর সে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞসা করল, মা, আপনি কে? কেনই বা এত রাত্রে একা শ্মশানে বসে কাঁদছেন? সে কোন উত্তর দিল না; এবং আগের থেকে আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

তখন বীরবর বারবার জিজ্ঞাসা করতে বললো, আমি রাজলক্ষ্মী, রাজা রূপসেনের প্রাসাদে নানা অন্যায় আচরণে ধর্মের ঘরে অধর্ম প্রবেশ করে আমাকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু আমি চলে গেলেই অলক্ষ্মী আসবে এবং তখন রাজার খুব অমঙ্গল হবে এবং

অল্পদিনের মধ্যে সে মারা যাবে। সেই দুঃখে আজ আবার মহা-শ্মশানে বসে এই রোদন ধ্বনি !'

এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে বীরবর শিউরে উঠল। দেবীর কাছে হাতজোড় করে বললো, মা, আপনি যা বললেন তা নিঃসন্দেহে ঠিক। কিন্তু যদি কোন উপায়ে রাজার বিপদ দূর করা যায় তবে আমাকে বলুন। আমি তা প্রাণ দিয়েও তা করব।

রাজলক্ষ্মী বললেন, সে বড় শক্ত কাজ, পারবে তুমি সে কাজ করতে ? এখান থেকে পূর্বদিকে আধযোজন দূরে মন্দিরে এক দেবী আছেন। যদি কেউ তার ছেলেকে নিজের হাতে ঐ দেবীর সামনে বলি দেয় তবে তাঁর দয়ায় রাজার সমস্ত অমঙ্গল কেটে যাবে।

এই কথা শুনে বীরবর বাড়ির দিকে রওনা হলো, রাজাও তার পেছন পেছন চললেন। বীরবর বাড়ি গিয়ে বউকে ডেকে তুলে, তাকে সব কথা খুলে বললো। সেও ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে বললো বাছা, তোমার মাথা কেটে দেবীকে অর্ঘ্য দিলে রাজার অমঙ্গল কেটে যাবে ও রাজ্য শক্তিশালী হবে।

ছেলে বললো, মা, এতো আমার সৌভাগ্যের কথা, প্রথমত তোমার আদেশ মত কাজ করছি, বাবার কর্তব্য পালনে সাহায্য করছি এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীরটা দেবতাকে নিবেদন করছি। এছাড়া আমার প্রাণত্যাগের এমন ভাল সময় আর আসবে না। একাজ যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

ছেলের এই কথা শুনে বীরবর যতটা আনন্দিত হল ঠিক ততটা দুঃখিত হল। তারপর সপরিবারে পূজার জিনিসপত্র নিয়ে সেই মন্দিরের দিকে চলল।

রাজা বীরবর ও তার পরিবারের প্রভুভক্তি দেখে আশ্চর্য হলেন এবং মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে গোপনে তাদের পেছন পেছন, চললেন শেষটা দেখতে।

কিছুক্ষণ পরে বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হলো, এবং ফুল,

ধূপ প্রদীপ ও নৈবেদ্য দিয়ে ভক্তিসহকারে পূজা করে দেবীর সামনে হাত জোড় করে বললো, দেবী! তোমাকে খুশি করবার জন্য আমার ছেলেকে তোমার কাছে বলি দিলাম। তোমার কৃপায় যেন রাজার দীর্ঘ আয়ু ও রাজ্য শক্তিশালী হয়। এই বলে খড়্গ দিয়ে বীরবর তার ছেলের মাথা কেটে দেবীর চরণে অর্ঘ্য দিল।

বীরবরের মেয়ে তার ভাইকে খুব ভালবাসত, এই দৃশ্য দেখে সেও সেই খড়্গ নিয়ে নিজের বুকে বসাল। বীরবরের স্ত্রী দুঃখে পাগল হয়ে নিজে আত্মহত্যা করল। তখন বীরবর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো—প্রভুর কাজ শেষ করলাম, স্ত্রী পুত্রকন্যা হারালাম, আর কী সুখে জীবন ধারণ করি; এই বলে সেও খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেললো।

রাজা আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, যে রাজ্যে প্রভুভক্ত সেবকের প্রাণ গেল, আর আমি সেই রাজ্য ভোগ করব না। তখন তিনি খড়্গটি তুলে নিজের বুকে বসাতে গেলেন।

তখন দেবী দূর্গা দেখা দিয়ে তাঁর হাত ধরে ফেললেন। বললেন, বৎস, তোমার সাহস দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি আমার কাছে বর চাও?

রাজা বললেন, মা যদি খুশি হয়ে থাক, তবে ঐ চারজনকে জীবনদান কর। দেবী 'তথাস্তু' বলে স্বর্গ থেকে অমৃত এনে মৃত চারজনের গায়ে ছিটিয়ে দিলে তারা সুস্থ হয়ে উঠে বসল—যেন ঘুম থেকে উঠল। বীরবর ও তার স্ত্রী-পুত্রদের বেঁচে উঠতে দেখে রাজার মন আনন্দে ভরে গেল এবং দেবীর পায়ে পড়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। রাজার ভক্তি দেখে ও স্তব শুনে দেবী খুশি হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে ও বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা সভায় এসে রাজা রূপসেন গতরাত্রের আশ্চর্য ঘটনার কথা সবার সামনে বলে, সভাসদ্‌দের সাক্ষী রেখে, প্রভুভক্ত বীরবরকে অর্ধেক রাজ্য দান করলেন।



তখন দেবী দুর্গা দেখা দিয়ে তাঁর হাত ধরে ফেললেন— পৃষ্ঠা ৩৫

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, এবার বলতো মহারাজ, এদের মধ্যে কে সবচেয়ে মহৎ ?

বিক্রমাদিত্য বললেন আমার বিশ্বাস রাজার উদারতাই শ্রেষ্ঠ !

বেতাল বললো, কেন ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, বীরবর প্রভুর উপকারের জন্য আত্মবলি সেবকের কর্তব্য কর্ম। বীরবর রাজার মঙ্গলের জন্য আত্মধর্ম পালন করেছে। রাজাও ভৃত্যের জন্য রাজ্যসম্পদ তুচ্ছ ভেবে প্রাণত্যাগে উদ্যত হলেন।—এইরূপ উদারতা কখনও শোনা যায় না।

এই কথা শুনে বেতাল পূর্বের প্রতিজ্ঞা অনুসারে শ্মশানে চলে গিয়ে গাছে ঝুলে রইল এবং বিক্রমাদিত্যও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে তাকে বৃক্ষ হতে নামিয়ে সন্ন্যাসীর আশ্রম পথের দিকে চললেন।

বেতাল তার চতুর্থ গল্প শুরু করল।



চতুর্থ উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ !

অনঙ্গ সেন নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন ভোগবতী নগরে। চূড়ামণি নামে তাঁর একটি শুকপাখি ছিল। পাখিটি তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। একদিন অনঙ্গ সেন শুককে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে আমাকে বল।

সে বললো, মহারাজ! আমি ভূত, ভবিষৎ, বর্তমান এই ত্রিকালদর্শী।

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, যদি তুমি তাই হও তাহলে বলতে পার আমার উপযুক্ত স্ত্রী কোথায় আছে যাকে আমি বিয়ে করতে পারি ?

শুক বললে মগধের রাজা বীর সেনের চন্দ্রাবতী নামে এক পরমা সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আছে, তিনিই তার পত্নীরূপে আপনার কাছে আসবেন।

রাজা অনঙ্গসেন চূড়ামণির কথার সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য সুপ্রসিদ্ধ রাজদৈবজ্ঞ চন্দ্রকান্তকে ডেকে এবিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন।

চন্দ্রকান্ত গণনা করেও ঐ একই কথা বলায় রাজা খুবই সন্তুষ্ট

হলেন এবং তাঁর অতি প্রিয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে মগধরাজ্যের কাছে দূত হিসেবে পাঠালেন বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে।

চন্দ্রাবতীরও মদনমঞ্জরী নামে একটি শারি ছিল। সেও ছিল সর্বজ্ঞ। চন্দ্রাবতী শারিকে জিজ্ঞাসা করলেন, শারি, তুমি ভূত ভবিষৎ, বর্তমান সবই বলতে পার। বল দেখি আমার বিবাহের যোগ কোথায় আছে?

শারি বললো, রাজকুমারী, ভোগবতী নগরের রাজা অনঙ্গসেনই তোমার স্বামী হবেন।

অনঙ্গসেন এবং চন্দ্রাবতী দুজনেই তাদের পাখির কাছ থেকে ভবিষ্যৎ জানতে পেরে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগী হলেন এবং সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই অনঙ্গসেনের দূত মগধরাজের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর আগমনের কারণ রাজার কাছে বললেন। রাজা খুশিমনে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং অনেক দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে এক ব্রাহ্মণকে বিয়ে পাকা করতে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন।

নির্দিষ্ট দিনে অনঙ্গসেন মগধে এসে চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করে নিজের রাজধানীতে ফিরে গিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

চন্দ্রাবতী যখন তাঁর শ্বশুরবাড়ি ভোগবতীতে আসেন তখন তাঁর অতি প্রিয় শারি মদনমঞ্জরীকেও সঙ্গে এনেছিলেন।

একদিন যখন অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী নানা বিষয়ে লঘু আলোচনা করছিলেন তখন রাজা রাণীকে বললেন, দেখ, একা থাকা বড়ই কষ্টকর। আমরা যখন বিয়ে করে সুখী হয়েছি তখন আমার ইচ্ছা আমাদের প্রিয় শুক-শারিকে এক খাঁচায় রাখি। একসঙ্গে দুজনে থাকলে তারাও আমাদের মত সুখী হবে। রাজার ইচ্ছায় শুক ও শারিকে একই খাঁচায় রাখা হল।

একদিন দুই পাখিতে তর্ক শুরু হলো। শুক বললো, দেখ এই

সংসারে ভোগই সারবস্তু। যে লোক এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেও ভোগ সুখ থেকে বঞ্চিত থাকে তার জন্মই বৃথা। সেই জন্য বলি তুমি সব বিষয়ে এমন নিরুৎসাহিনী কেন ?

শারিকা এই কথা শুনে বললো, পুরুষজাতি বড়ই স্বার্থপর, শঠ, অধর্মী এবং খুনি। সেইজন্য পুরুষসঙ্গ আমার মোটেই ভাল লাগে না।

শুক রেগে বললো মেয়েদের চরিত্রের কথা আর বলো না। মেয়েরা অত্যন্ত চপলা, কুটিলা, মিথ্যা কথায় পটু, লোভী ও পুরুষ-ঘাতিনী।

উভয়ের এই তর্ক শুনে রাজা বললেন, তোমরা মিছিমিছি তর্ক করে তিক্ততার সৃষ্টি করছ কেন ?

শারি বললো, মহারাজ, এ তর্ক মিছিমিছি নয়, পুরুষরা যে কত বড় অধর্মী তা আমার জানা আছে। শুনুন তবে বলি সেই সত্য কাহিনী।

ইলাপুরে মহাধন নামে একজন ঐশ্বর্যবান বণিক বাস করতেন। বিয়ের পর বহুদিন চলে গেছে কিন্তু একটিও সন্তান না হওয়ায় বড়ই দুঃখে দিন কাটে মহাধনের। অবশেষে বেশী বয়সে তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করায় বণিকের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি পুত্রের নাম রাখলেন নয়নানন্দ। পরম যত্নে বাবা মা তাকে পালন করতে লাগলেন। পুত্রের যখন পাঁচ বছর বয়স হলো তখন লেখাপড়া শেখার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন।

কিন্তু তার স্বভাব মোটেই ভাল না। ছোটবেলা থেকেই নয়নানন্দ দুষ্ট সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতো, লেখাপড়ায় ছিল অমনোযোগী। লেখাপড়ার থেকে খেলাধূলা বেশী ভালবাসত। অনেক বদ অভ্যাস শিখল এবং মুখে খারাপ কথা ছাড়া ভাল কথা ছিল না। বয়স যত বাড়তে লাগলো এই দোষগুলিও সেইমত বাড়তে লাগলো।

যথাসময়ে বণিকের মৃত্যু হলো। বাবার মৃত্যুতে অতুল ঐশ্বর্য

সবই নয়নানন্দের হাতে এসে পড়ায় সে দু'হাতে টাকা ওড়াতে লাগলো। টাকা কেবল খরচই হচ্ছে, উপার্জন হচ্ছে না কিছুই। এইভাবে চললে রাজাও একদিন ফকির হয়—নয়নানন্দও দুর্দশায় পড়ল। সবকিছু বিনষ্ট হলো!

এই অবস্থায় ইলাপুর ত্যাগ করে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন চন্দ্রপুরে তার বাবার বন্ধু হেমগুপ্তের কাছে গিয়ে তার পরিচয় দিল। বন্ধুপুত্রকে দেখে তিনি খুশি হলেন এবং এখানে হঠাৎ আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

নয়নানন্দ মিথ্যে কথা বললো। সে বললো, কয়েকটা জাহাজ নিয়ে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু দৈব প্রতিকুল হওয়ায় সমুদ্রে প্রবল ঝড় ওঠে এবং আমার সমস্ত জাহাজ জলে ডুবে যায়। ভাগ্যে আমার মৃত্যু ছিল না তাই কোনপ্রকারে একখণ্ড কাঠ সম্বল করে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে তীরে এসে আছড়ে পড়লাম। তার দুর্ভাগ্যের জন্য নয়নানন্দ কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলতেও ভুললো না!

সব ঘটনা শুনে বন্ধুপুত্রের জন্য বড়ই মায়া হলো। তাকে পরম যত্নে প্রতিপালন করতে লাগলেন। হেমগুপ্ত মনে মনে ভাবলেন কন্যা রত্নাবতীর একটি সুপাত্রের তো অনেকদিন ধরেই খোঁজাখুঁজি করছি কিন্তু মনের মত পাত্র পাচ্ছি না। ভগবান বুঝি পাত্র ঘরে এনেই উপস্থিত করেছেন। সদ্বংশজাত এবং প্রচুর অর্থসম্পত্তির মালিক এই ছেলের সঙ্গে বিলম্ব না করে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ভালো।

স্ত্রীকে তার মনের কথা খুলে বলায় স্ত্রীও খুশি হয়ে মত দিলেন। তাঁরও ছেলেটিকে খুবই পছন্দ।

হেমগুপ্ত তাঁর কন্যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করলে নয়নানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাবে সম্মত হলো। তারপর শুভ দিন দেখে রত্নাবতীর সঙ্গে নয়নানন্দের বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর উভয়ে পরম সুখে দিনগুলো কাটাতে লাগলো।

এইভাবে কিছুদিন চলবার পর নয়নানন্দের এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগলো না। আগেকার সেই উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলিই তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো। তাই নয়নানন্দ ঠিক করলো এখান থেকে চলে যেতে হবে।

সে তার স্ত্রীকে বললো, দেখ, অনেকদিন থেকে আমি দেশ ও আত্মীয় ছাড়া হয়ে এখানে আছি। একবার দেশে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। তুমি বাবা মাকে মত করিয়ে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।

হেমগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী জামাইয়ের এই প্রস্তাব শুনে খুশি হলেন। এমনটিই তো হওয়া উচিত। জামাই চিরজীবন শ্বশুরের কাছে থাকবে এ আশা করা ঠিক না। জামাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরা সম্মত হলেন এবং শুভ দিনে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিলেন আর মেয়ের সঙ্গে দিলেন অনেক অলঙ্কার ও ধনরত্ন।

কিছুটা পথ চলার 'পর এক গভীর বন পড়ল পথে। নয়নানন্দ স্ত্রীকে বললো, দেখ এই বন খুবই ভয়াবয়, এখানে দস্যুর ভয় আছে, পালকিতে যাওয়া নিরাপদ নয়, আমরা পালকি ছেড়ে দিয়ে গরীবের বেশে হেঁটে যাই আর তোমার যত অলঙ্কার আছে একটা পুঁটলি বেঁধে আমাকে দাও। গরীবের বেশে গেলে দস্যুরা আমাদের সন্দেহ করবে না। শহরে গেলে আবার সব অলঙ্কার পরে নেবে।

সরলা রত্নাবতী স্বামীর কথামত সব অলঙ্কার স্বামীকে দিয়ে দিল। নয়নানন্দ সঙ্গের লোকজন ও পালকি বাহকদের বিদায় দিয়ে গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো। যেতে যেতে বনের মধ্যেই একটি কুয়োর মধ্যে পতিপরায়ণা ও পরম শুভাকাঙ্ক্ষী রত্নাবতীকে ঠেলে দিয়ে সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থাদি নিয়ে পালিয়ে গেল।

রত্নাবতী সেই নির্জন বনে কুয়োর মধ্যে পড়ে বাবা মার নাম করে জোড়ে জোড়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

ভগবানের অশেষ কৃপায় একজন লোক সেই নির্জন বনের মধ্যে

দিয়ে চলতে চলতে কান্না শুনে সেখানে এসে সেই কুয়োর মধ্যে চেয়ে দেখে এক পরমা সুন্দরী একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে। লোকটি তাড়াতাড়ি অনেক কষ্টে রত্নাবতীকে কুয়ো থেকে উপরে তুলে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে? কি তোমার পরিচয়? এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে তুমি এলেই বা কি করে।

রত্নাবতী দেখল সব ঘটনা বললে স্বামীর সম্বন্ধে অনেককিছু বলতে হয় তাই প্রকৃত কারণ গোপন করে বললো, চন্দ্রপুরের হেমগুপ্ত বণিক আমার বাবা, আমার নাম রত্নাবতী। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম কিন্তু এখানে আসার পর কয়েকজন দস্যু আমার সব অলঙ্কার নিয়ে আমাকে এই কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং আমার স্বামীকে মারতে মারতে নিয়ে গিয়েছে তারা।

রত্নাবতীর দুঃখের কথা শুনে লোকটিরও মনে দুঃখ হলো। দয়ালু লোকটি অতি যত্নে রত্নাবতীকে তখনই তার বাবা ও মার কাছে পৌঁছে দিল।

সেখানেও রত্নাবতী প্রকৃত ঘটনা গোপন করায় বাবা মা ও আত্মীয়রা রত্নাবতীর দুঃখে খুবই কাতর হলো। জামাইয়ের ভাগ্যে কি ঘটেছে চিন্তা করে কাঁদতে লাগলো। বাবা হেমগুপ্ত কন্যাকে পুনরায় অলঙ্কার তৈরি করে দিয়ে এবং নানাভাবে শোক কমাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে নয়নানন্দ দেশে ফিরে স্ত্রীর অলঙ্কারাদি সব বেচে দিয়ে জুয়া এবং মদে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সব শেষ করে ফেলল। সে আবার দুর্দশার মধ্যে পরায় ঠিক করলো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আবার কিছু অর্থ হাতিয়ে পালিয়ে আসবে। তার স্ত্রীর প্রতি যে ব্যবহার সে করেছে তা নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির কেউ জানতে পারে নাই। মনে মনে এইরূপ কুমতলব এঁটে একদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো।

সেখানে পৌঁছে প্রথমেই দেখা হয়ে গেল স্ত্রী রত্নাবতীর সঙ্গে।

এইভাবে কিছুদিন চলবার পর নয়নানন্দের এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগলো না। আগেকার সেই উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলিই তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো। তাই নয়নানন্দ ঠিক করলো এখান থেকে চলে যেতে হবে।

সে তার স্ত্রীকে বললো, দেখ, অনেকদিন থেকে আমি দেশ ও আত্মীয় ছাড়া হয়ে এখানে আছি। একবার দেশে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। তুমি বাবা মাকে মত করিয়ে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।

হেমগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী জামাইয়ের এই প্রস্তাব শুনে খুশি হলেন। এমনটিই তো হওয়া উচিত। জামাই চিরজীবন শ্বশুরের কাছে থাকবে এ আশা করা ঠিক না। জামাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরা সম্মত হলেন এবং শুভ দিনে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিলেন আর মেয়ের সঙ্গে দিলেন অনেক অলঙ্কার ও ধনরত্ন।

কিছুটা পথ চলার 'পর এক গভীর বন পড়ল পথে। নয়নানন্দ স্ত্রীকে বললো, দেখ এই বন খুবই ভয়াবয়, এখানে দস্যুর ভয় আছে, পালকিতে যাওয়া নিরাপদ নয়, আমরা পালকি ছেড়ে দিয়ে গরীবের বেশে হেঁটে যাই আর তোমার যত অলঙ্কার আছে একটা পুঁটলি বেঁধে আমাকে দাও। গরীবের বেশে গেলে দস্যুরা আমাদের সন্দেহ করবে না। শহরে গেলে আবার সব অলঙ্কার পরে নেবে।

সরলা রত্নাবতী স্বামীর কথামত সব অলঙ্কার স্বামীকে দিয়ে দিল। নয়নানন্দ সঙ্গের লোকজন ও পালকি বাহকদের বিদায় দিয়ে গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো। যেতে যেতে বনের মধ্যেই একটি কুয়োর মধ্যে পতিপরায়ণা ও পরম শুভাকাঙ্ক্ষী রত্নাবতীকে ঠেলে দিয়ে সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থাদি নিয়ে পালিয়ে গেল।

রত্নাবতী সেই নির্জন বনে কুয়োর মধ্যে পড়ে বাবা মার নাম করে জোড়ে জোড়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

ভগবানের অশেষ কৃপায় একজন লোক সেই নির্জন বনের মধ্যে

দিয়ে চলতে চলতে কান্না শুনে সেখানে এসে সেই কুয়োর মধ্যে চেয়ে দেখে এক পরমা সুন্দরী একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে। লোকটি তাড়াতাড়ি অনেক কষ্টে রত্নাবতীকে কুয়ো থেকে উপরে তুলে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কে? কি তোমার পরিচয়? এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে তুমি এলেই বা কি করে।

রত্নাবতী দেখল সব ঘটনা বললে স্বামীর সম্বন্ধে অনেককিছু বলতে হয় তাই প্রকৃত কারণ গোপন করে বললো, চন্দ্রপুরের হেমগুপ্ত বণিক আমার বাবা, আমার নাম রত্নাবতী। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম কিন্তু এখানে আসার পর কয়েকজন দস্যু আমার সব অলঙ্কার নিয়ে আমাকে এই কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং আমার স্বামীকে মারতে মারতে নিয়ে গিয়েছে তারা।

রত্নাবতীর দুঃখের কথা শুনে লোকটিরও মনে দুঃখ হলো। দয়ালু লোকটি অতি যত্নে রত্নাবতীকে তখনই তার বাবা ও মার কাছে পৌঁছে দিল।

সেখানেও রত্নাবতী প্রকৃত ঘটনা গোপন করায় বাবা মা ও আত্মীয়রা রত্নাবতীর দুঃখে খুবই কাতর হলো। জামাইয়ের ভাগ্যে কি ঘটেছে চিন্তা করে কাঁদতে লাগলো। বাবা হেমগুপ্ত কন্যাকে পুনরায় অলঙ্কার তৈরি করে দিয়ে এবং নানাভাবে শোক কমাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে নয়নানন্দ দেশে ফিরে স্ত্রীর অলঙ্কারাদি সব বেচে দিয়ে জুয়া এবং মদে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সব শেষ করে ফেলল। সে আবার দুর্দশার মধ্যে পরায় ঠিক করলো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আবার কিছু অর্থ হাতিয়ে পালিয়ে আসবে। তার স্ত্রীর প্রতি যে ব্যবহার সে করেছে তা নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির কেউ জানতে পারে নাই। মনে মনে এইরূপ কুমতলব এঁটে একদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো।

সেখানে পৌঁছে প্রথমেই দেখা হয়ে গেল স্ত্রী রত্নাবতীর সঙ্গে।

নয়নানন্দ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তার স্ত্রী বেঁচে আছে, তাই স্ত্রীকে দেখে সে চিন্তিত হয়ে পড়লো।

পতিপ্রাণা রত্নাবতী স্বামীকে ভাবল স্বামী যতই কুস্বভাবের হোক স্ত্রীর সে পরম গুরু। স্বামীর নিন্দা করা বা শোনাও পাপ। সব বিপদ থেকে স্বামীকে রক্ষা করাই স্ত্রীর পবিত্র কর্তব্য। সুতরাং এখন স্বামীকে অনাদর করলে পাপ হবে! স্বামী যে ব্যবহার আমার প্রতি করেছেন তা ভুলক্রমেই করেছেন। আমি এখানে আছি সেকথা না জেনেই উনি এখানে এসেছেন সন্দেহ নাই; সুতরাং প্রথমেই উনি যাতে ভয় না পান তার ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে ভয়ে এখনই পালিয়ে যাবেন।

এই কথা মনে মনে ভেবে স্বামীর সামনে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি কিছু ভেব না, আমার বাড়ির কেউ প্রকৃত ঘটনা জানে না। আমি সকলকে বলেছি দস্যুরা আমার সব অলঙ্কারাদি নিয়ে আমাকে কূয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তোমার জন্য বাবা মা খুবই চিন্তায় আছেন, তোমাকে দেখলে তাঁরা খুবই আনন্দিত হবেন। তুমি যেন আবার আমাকে ফেলে পালিয়ে যেও না। তুমি আমার সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহারই করে থাক না কেন, আমি তোমারই আছি।

স্ত্রীর কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলো নয়নানন্দ। এতদিন পরে জামাইকে দেখে শ্বশুর শ্বাশুড়ি উভয়েই খুব আনন্দিত হল। জামাইকে ফিরে পেয়ে বাড়িতে যেন উৎসবের আমেজ।

রাত্রে স্বামীসহবাসের জন্য রত্নাবতী বাবার দেওয়া অলঙ্কার পরে অতি উৎফুল্ল হৃদয়ে শয়নগৃহে প্রবেশ করলো। অনেক দিন পর স্বামীকে ফিরে পেয়ে সে সবকিছু আজ ভুলে গিয়েছে।

স্বামীর কিন্তু কোন বিষয়ে তেমন উৎসাহ নেই; সে ঘুমাবার ভান করেছে। রত্নাবতী ভাবল স্বামী পথশ্রমে ক্লান্ত তাই সেও অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সেই নরাধম সুযোগ বুঝে সঙ্গে নিয়ে

আসা তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে পতিপ্রাণা স্ত্রীকে হত্যা করে সব অলঙ্কারাদি নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে গেল।

গল্প শেষ করে সারি বললো, মহারাজ, যে কাহিনী বললাম তা আমার স্বচক্ষে দেখা। সেই থেকে পুরুষজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মেছে আমার। প্রতিজ্ঞা করেছি কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না এবং তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব। পুরুষরা অত্যন্ত স্বার্থপর এবং নৃশংস। বিষধর সাপের সঙ্গে বাস করা যায় কিন্তু পুরুষের সঙ্গে বাস করা যায় না।

রাজা হেসে বললেন, ওহে চূড়ামণি, এবার তুমি বল কেন তুমি স্ত্রীজাতির উপর কি জন্য এত বিরক্ত এবং তাদের দেখতে পার না।

তখন শুক বললো, তবে শুনুন মহারাজ।

কাঞ্চনপুর নগরে সাগরদত্ত নামে এক বণিক ছিলেন। তাঁর ছেলে শ্রীদত্ত ছিল রূপে গুণে ও স্বভাবে সকলের প্রসংশার যোগ্য।

অনঙ্গপুরের সোমদত্ত বণিকের কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পর শ্রীদত্ত বাণিজ্য করতে বিদেশে গেলে স্ত্রী জয়শ্রী তার বাবার কাছে থাকল! অনেক দিন চলে গেল কিন্তু শ্রীদত্ত বিদেশ থেকে না ফেরায় জয়শ্রী অধৈর্য হয়ে পড়ল। তার যেসব সখীদের বিয়ে হয়েছে তারা কেমন স্বামীর সঙ্গে সুখে বাস করছে কিন্তু তার ভাগ্যে ঘরসংসার নেই।

একদিন তার প্রিয় সখীকে মনের কষ্ট প্রকাশ করলো। জয়শ্রী বললো, দেখ সখী, সংসার কি জিনিস তা জানতে পারলাম না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, একা একা এভাবে আমার দিন আর কাটছে না, আমি বড়ই দুঃখিনী। তুমি এর একটা উপায় কর, না হলে আমার প্রাণ যায়।

সখী বললো, প্রিয় সখী ধৈর্য ধর। ভগবান মুখ তুলে চাইলে

তুমি তোমার স্বামীকে ফিরে পাবে।

জয়শ্রী কিন্তু সখীর এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তার মনের ইচ্ছা অন্যরকম। সে সেখান থেকে চলে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখতে লাগলো। সেই সময় একজন রূপবান ও সুবেশ যুবক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। দুজনের চোখাচোখি হল। জয়শ্রীর মনে হল, এর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত তবে আমি কতই না সুখী হতাম। জয়শ্রী তখন তার সখীকে ডেকে বললো, সখি, যেভাবে পার ঐ যুবকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দাও!

সখী তার কথামত সেই যুবকের কাছে গিয়ে বললো, মহাশয়, সোমদত্তের কন্যা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সন্ধ্যার পর আপনি আমার গৃহে আসুন ঐ গৃহটি আমার।

যুবক এই প্রস্তাবে খুবই সন্তুষ্ট হল এবং তার কথায় সম্মত হল।

সখী জয়শ্রীকে সব কথা বললে জয়শ্রী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উপহার দিল এবং তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

সন্ধ্যার পর সেই যুবক সাজগোজ করে সেই নির্দিষ্ট গৃহে গিয়ে উপস্থিত হল। সখী যুবককে সমাদরে বসিয়ে জয়শ্রীকে সংবাদ দিলে সে সন্তুষ্ট হয়ে সখীকে বললো, একটু রাত হলে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমি যাব।

তারপর জয়শ্রী যথাসময়ে সেই যুবকের সঙ্গে মিলিত হল এবং মনের বাসনা পূর্ণ করল। এরপর প্রতিদিনই জয়শ্রীর এই অভিসার চলতে লাগল।

কিছুদিন পর শ্রীদত্ত বাণিজ্য শেষ করে শ্বশুরবাড়ি ফিরে এল। অনেকদিন পর জামাইকে পেয়ে সোমদত্ত ও তাঁর স্ত্রী খুবই খুশি হলেন। কিন্তু স্বামী ফিরে আসায় জয়শ্রী খুবই অসন্তুষ্ট হল। প্রিয় সখীর সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতে লাগল।

রাত্রে শাশুড়ি জামাইকে খাইয়ে দাইয়ে তার নির্দিষ্ট ঘরে শুতে পাঠিয়ে পরে মেয়েকেও পাঠিয়ে দিলেন। জয়শ্রীর এতে আগ্রহ না থাকলেও মায়ের কথা ফেলতে পারল না!

শ্রীদত্ত স্ত্রীকে কাছে পেয়ে খুশি হয়ে বিদেশ থেকে তার জন্য আনা সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দিতে গেল কিন্তু জয়শ্রী এতে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট না হয়ে বরং মুখ বেঁকিয়ে সেসব জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিল। তখন শ্রীদত্ত খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে অগত্যা শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত থাকায় ঘুমিয়েও পড়ল।

স্বামী ঘুমিয়েছে দেখে জয়শ্রী তাড়াতাড়ি সেইসব ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া মূল্যবান অলঙ্কার ও শাড়ী পরে সেই গভীর রাতে একাকিনী সেই যুবকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটল। সেই সময় এক চোর কাছেই লুকিয়ে ছিল। এত রাতে বহু অলঙ্কারে সজ্জিতা একটি স্ত্রীলোককে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে সে তার পিছু নিল।

এদিকে সেই যুবক একাকী জয়শ্রীর আসার প্রতীক্ষায় সময় কাটাচ্ছিল কিন্তু একটা বিষাক্ত সাপ তাকে কামড়ে দেওয়ায় সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। জয়শ্রী সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখল যুবক তার আসতে বিলম্ব হওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বারবার তাকে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যে মৃত তাকে কে জাগাবে! জয়শ্রী ভাবল আসতে বিলম্ব হওয়ায় যুবক অভিমানে আমার সঙ্গে কথা বলছে না। তার পাশে শুয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মিষ্ট স্বরে তার বিলম্বের কারণ বলতে লাগল।

চোরটি কাছেই দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল!

কাছেই শিরীষ গাছে একটা পিশাচ ছিল। সে এইসব কাণ্ড দেখে মেয়েটির উপর খুবই রেগে গেল। সে মনে মনে বললো, এরকম দুশ্চারিণীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত। মনে মনে এই কথা ভেবে সেই যুবকের মৃতদেহের মধ্যে ঢুকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জয়শ্রীর নাকের ডগাটি দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে আবার গাছে গিয়ে চড়ল।

চোরটি এমন তাজ্জব ব্যাপার দেখে খুবই আনন্দিত হল।

এতক্ষণে জয়শ্রী বুঝতে পারল যে যুবকটি মৃত। সে তখন তার প্রিয় সখীর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললো। সখীকে বললো, বল আমি এখন কি করি? এ অবস্থায় আমি বাবা মার কাছে যাই কিভাবে? আর এর কারণই বা কি বলব? বিশেষ করে আমার স্বামীটিও আজ উপস্থিত। এই সঙ্কট অবস্থায় মৃত্যু ছাড়া আমার আর পথ নেই, তুমি আমাকে বিষ এনে দাও তাই পান করে আমি বিপদ থেকে উদ্ধার পাই। এই বলে কপাল চাপড়াতে লাগল।

সব শুনে জয়শ্রীর সখী চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর জয়শ্রী বললো, আমি একটা ভাল উপায় বের করেছি। ভেবে দেখ কেমন হবে। আমি এই অবস্থায় ঘরে ঢুকে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করব! আমার কান্না শুনে সকলে ছুটে এসে কারণ জানতে চাইলে বলব, আমার স্বামী অকারণে ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমাকে অনেক মেরেছে এবং দাঁত দিয়ে আমার নাকের ডগা কেটে নিয়েছে।

সখী তার এই মত সমর্থন করল।

আর বিলম্ব না করে জয়শ্রী ছুটতে ছুটতে স্বামী যে ঘরে শুয়ে আছে সেই ঘরে গিয়ে শুয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল: ও মা গো, ও বাবা গো, এ কেমন স্বামীর হাতে আমাকে দিয়েছ গো, খুনেটা যে আমার নাক কেটে নিয়েছে গো!

জয়শ্রীর কান্না শুনে বাড়ির সকলে ছুটে এল সেই ঘরে। দেখল তাদের মেয়ের নাক কাটা, সমস্ত গা ও কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তখন সকলে ব্যস্ত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

গোলমাল শুনে বেচারা জামাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেছে ইতিমধ্যে। সে ভ্যাবাচেকা খেয়ে চুপটি করে বসে আছে।

জয়শ্রী তার স্বামীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো, ঐ খুনে আমার এই দশা করেছে।

তখন সকলেই শ্রীদত্তকে গালাগালি করতে লাগল। শ্রীদত্ত

কিছুই জানে না। এই সব কাণ্ড দেখে সে বিস্মিত এবং দুঃখিত। মনে মনে বললো, অনেক দিন আমি দেশে ছিলাম না। সবকিছু না জেনে এখানে আসা ঠিক হয় নাই। এখন আমি বুঝতে পারছি আমার স্ত্রী চরিত্রহীনা। তাই প্রথম সাক্ষাতেই সে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নাই। এই জন্যই নীতিজ্ঞেরা বলেছেন—মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারাও স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা বুঝতে পারেন না। জানি না আমার কপালে কি ঘটবে!

পরদিন সকালেই শ্বশুর তাকে কোটালের হাতে সঁপে দিলেন। তারপর তাকে বিচারপতির সামনে দাঁড়াতে হল।

বাদী ও প্রতিবাদীর সকল কথা মনযোগ দিয়ে শুনে বিচারপতি জয়শ্রীর কথাই বিশ্বাস করলেন এবং শ্রীদত্তকে শূলে দিতে আদেশ দিলেন।

চোরটার কিন্তু মানবতাবোধ ছিল। সে বিচারালয়ের অদূরেই দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখছিল। বিনা অপরাধে একটি লোকের শাস্তি হচ্ছে দেখে সে বিচারকের সামনে এসে বললো হুজুর ধর্মাবতার, আপনি সবকিছু না জেনেই এই নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছেন, আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি ন্যায় বিচার করুন। এই ব্যভিচারিণীর কথা বিশ্বাস করবেন না। এর মত পাপিষ্ঠা নারী এ জগতে বিরল।

বিচারক এই কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন। পরক্ষণেই বিচারক প্রকৃত ঘটনা জানতে একজন লোককে ধাত্রীর বাড়ী পাঠালেন। সেই লোক ধাত্রীর বাড়ী গিয়ে তার মুখের মধ্য হতে জয়শ্রীর নাকের ডগা নিয়ে এল। তখন বিচারক চোরের কথাই সত্য বলে মেনে নিলেন এবং জয়শ্রীর মাথা মুড়ে, ঘোল ঢেলে উল্টো গাধায় চড়িয়ে শহরময় ঘোরাতে আদেশ দিলেন আর নির্দোষ শ্রীদত্তকে মুক্তি দিলেন এবং চোরকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন।

গল্প শেষ করে শুক বললো মহারাজ সেই হতে স্ত্রীলোকের উপর এত ঘৃণা আমার।

গল্প শেষ করে বেতালও বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ! জয়শ্রী আর নয়নানন্দ এই দুজনের মধ্যে কে বেশী— হতভাগ্য!

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে দুইজনই সমান।

ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ থেকে নেমে শ্মশানে ফিরে গিয়ে গাছে ঝুলে রইল। বিক্রমাদিত্যও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে ফেলে আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

বেতালও তার পঞ্চম গল্প আবার আরম্ভ করল।



পঞ্চম উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ ! ধারানগরে মহাবল নামে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করতেন। হরিদাস বলে এক ব্রাহ্মণ তাঁর দূত ছিলেন। রাজা তাঁকে অত্যন্ত ভাল বাসতেন। হরিদাসের পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল। তার নাম মহাদেবী। মহাদেবী বিবাহযোগ্যা হলে বাড়ীতে তার বিবাহ সম্বন্ধে প্রতিদিন আলোচনা হত।

একদিন মহাদেবী তার পিতাকে বলল—বাবা। আমায় যাঁর সঙ্গে বিয়ে দেবেন তিনি যেন সকল বিদ্যায় সুপণ্ডিত হন।

হরিদাস কন্যার উচ্চ আশা শুনে মহানন্দে মহাদেবীর পাত্র খুঁজতে লাগলেন।

একদিন রাজা হরিদাসকে ডেকে বললেন—হরিদাস শোন, দক্ষিণ দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু, বহুদিন তাঁর কোন সংবাদ পাইনা, সেজন্য মনে শান্তি পাচ্ছি না। তুমি একবার গিয়ে আমার কুশল জানিয়ে তাঁর সুসংবাদ নিয়ে এস।

হরিদাস বিলম্ব না করে হরিশ্চন্দ্র রাজার রাজধানীতে গিয়ে তাঁকে নিজ প্রভুর কুশল দিলেন। বন্ধুর কুশল সংবাদ পেয়ে হরিশ্চন্দ্র মহাআনন্দিত হলেন।

হরিদাস রাজার যত্ন ও অনুরোধে কিছুদিন সেখানে থেকে গেলেন।

একদিন রাজা সভাসদদের নিয়ে সভায় বসে আছেন এবং হরিদাসও সেখানে উপস্থিত ছিল। রাজা হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা হরিদাস, তোমার কি মনে হয়? কলিযুগ কি আরম্ভ হয়েছে?

তখন হরিদাস হাতজোড় করে বিনয়ের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ মহারাজ কলিকাল আরম্ভ হয়েছে এবং সেইজন্যই সংসারে মিথ্যা প্রবঞ্চনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সত্য হ্রাস পেয়েছে, বসুন্ধরা এখন অনেক কম শস্য দিচ্ছে, আজকাল লোকে মুখে মিষ্ট কথা বললেও অন্তর কপটতায় ভরা। রাজারা প্রজাদের সুখসমৃদ্ধির দিকে তাকায় না, কেবল ধনভাণ্ডার কিভাবে প্রজাদের শোষণ করে পূর্ণ করবে সেই চিন্তা করে! ব্রাহ্মণরা শুভ কাজের মধ্যে দিয়ে পূণ্যার্জনের চেয়ে লোভী হয়ে উঠেছে। স্ত্রীলোকেরা লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে স্বাধীনভাবে চলছে। পুত্র পিতার মত শ্রদ্ধেয়কেও অবজ্ঞা করে এবং তার সেবায় তেমন মন নেই। ভাই ভাইকে আর স্নেহ বা শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে সরল মনে মেলামেশা করে না। কেউ আর নিয়মিত শাস্ত্র আলোচনা বা শাস্ত্রানুযায়ী কাজকর্ম করে না। সকলেই বিদ্যা ও বুদ্ধির অহঙ্কারে নিজেদের বানানো যুক্তিজালে বেদকে উপেক্ষা করে চলে। এই জন্যেই বলছি মহারাজ, পৃথিবী থেকে ধর্ম চলে গিয়ে সেখানে অধর্ম এসে স্থানলাভ করেছে।

রাজা এই সব জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে হরিদাসের খুবই প্রশংসা করলেন।

সভাশেষে রাজা অন্তঃপুরে চলে গেলে হরিদাস তার নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করে দেখে একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণপুত্র সেখানে বসে আছে।

হরিদাস তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণপুত্র বললো আপনার কাছে আমার কিছু চাইবার আছে।

হরিদাস এই কথায় বিস্মিত হয়ে বললো, বল তোমার কি চাই। যদি আমার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হয় তবে অবশ্যই তা তুমি পাবে।

ব্রাহ্মনপুত্র অসঙ্কোচে বললো, আপনার একটি পরমাসুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আছে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই, আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিন।

হরিদাস বললো, আমার কন্যার ইচ্ছা—যে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন হবে, তাকেই বিয়ে করবে।

ব্রাহ্মণপুত্র বললো, আমি ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান অর্জনে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছি, তা ছাড়া আমি এমন এক অসাধারণ গুণের অধিকারী যে আমি এমন একখানা রথ তৈরি করেছি যার সাহায্যে যে পথে যেতে এক বছর সময় লাগবার কথা তা অতি অল্প সময়ের মধ্যে চলে যাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণপুত্রের কথা শুনে হরিদাস খুশি হল এবং সকালেই তাকে রথ নিয়ে আসতে বললো।

রাজার কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে হরিদাস দেশে ফেরার আয়োজন করল।

পরদিন যথাসময়ে ব্রাহ্মণপুত্র রথ নিয়ে উপস্থিত হলে উভয়ে সেই রথে চড়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধারানগরে গিয়ে উপস্থিত হল।

এদিকে হরিদাসের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী এবং পুত্র দুটি পৃথক পৃথক পাত্র ঠিক করে তাদের কথা দিয়ে রেখেছিল যে হরিদাস বিদেশ থেকে ফিরে এলেই মহাদেবীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে।

এবার যখন সেই দুই হবু বর জানতে পারল যে হরিদাস বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে তখন তারা হরিদাসের বাড়ি এসে উপস্থিত হল।

তিন বর উপস্থিত হরিদাসের বাড়ি। হরিদাস সব শুনে খুবই বিপদে পড়ল। মনে মনে চিন্তা করল, তিনজনই বিদ্বান ও অসাধারণ গুণের অধিকারী, এখন কাকে রেখে কাকে ত্যাগ করি। হরিদাস

তাদের তিনজনকেই বললো, তোমরা আমার গৃহে আজকের রাতটা থাক, আমি এই উভয় সঙ্কটে স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করি এ অবস্থায় কি করা যায়।

তিন হবু বর এ কথায় সম্মত হয়ে সেখানেই রয়ে গেল।

কিন্তু ভাগ্যে যা আছে তা ত হবেই ; বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস অতর্কিতে এসে মহাদেবীকে চুরি করে নিয়ে গেল।

সকালে খোঁজ করে দেখা গেল মেয়ে মহাদেবী ঘরে নেই। তখন সকলে পরামর্শ করতে বসলো। তিন ব্রাহ্মণপুত্রও ঘটনা শুনে তাদের কাছে উপস্থিত হল। এদের মধ্যে একজন সমাধিবলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত চোখের সামনে দেখতে পারত। সে বললো, আপনারা, চিন্তিত হবেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি, এক রাক্ষস আপনার কন্যার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করে নিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে রেখেছে। সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায় চিন্তা করুন।

দ্বিতীয় জন শুনে বললো, আমার এমন বিদ্যা জানা আছে যার সাহায্যে শব্দকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করতে পারি, কিন্তু সেখানে যাওয়ার কি উপায়?

তৃতীয় জন বললো, কোন চিন্তা নেই, আমার রথ প্রস্তুত, এই রথে চড়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের পরম কাম্য কন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে সকলের চিন্তা দূর কর।

তখন সময় নষ্ট না করে সেই রথে চড়ে বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হয়ে রাক্ষসকে বধ করে কন্যা মহাদেবীকে সকলের সামনে উপস্থিত করল।

কিন্তু বিবাদ দেখা দিল তিন ব্রাহ্মণের মধ্যে। সকলেই দাবী করল মহাদেবীকে। কারণ তিনজনের বিদ্যার সাহায্যেই মহাদেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ব্রাহ্মণপুত্রদের বাদানুবাদ শুনে কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তায় পড়লো হরিদাস।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ!



"রাক্ষসকে বধ করে কন্যা মহাদেবীকে সকলের সামনে উপস্থিত করল।" পৃষ্ঠা৫৪

এবার বলত, এই তিনজনের মধ্যে কে মহাদেবীকে পাণিগ্রহণের যোগ্য ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, যে ব্রাহ্মণপুত্র রাক্ষসকে বধ করে মহাদেবীকে ফিরিয়ে এনেছে তারই মহাদেবীকে পাওয়া উচিৎ।

বেতাল বললো, তিনজনই বিদ্যায় সমান, কেউ কারো থেকে কম নয়, এর যে কোন একজনের সাহায্য না পেলে মহাদেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হত না, তবে কেন দ্বিতীয় জনই মহাদেবীকে পাওয়ার যোগ্য হবে ?

রাজা বললেন, তিনজনই অশেষ গুণের অধিকারী সন্দেহ নেই কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে দ্বিতীয় জনের দ্বারাই অবশেষে মহাদেবীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল পুনরায় বিক্রমাদিত্যের কাঁধ থেকে নেমে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

রাজাও গাছে উঠে বেতালকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। বেতালও ষষ্ঠ গল্প আরম্ভ করল।



ষষ্ঠ উপাখ্যান

বেতাল কহিল মহারাজ।

ধর্মপুর নামে একটি প্রসিদ্ধ নগর আছে। সেখানকার রাজা অতিশয় ধার্মিক, তাঁর মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা একটি মন্দির নির্মাণ করে সেখানে কাত্যায়নীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। এবং যথা বিধানে তাঁর পূজা করেন।

রাজা দেবতার আরাধনা ও গোব্রাহ্মণে বড় যত্নবান ছিলেন। দেবীর মহা সমারোহে প্রতিদিন পূজা করে করযোড়ে প্রার্থনা করতেন হে দেবী, কৃপা করে আমাকে পরম রূপবান ও গুনবান পুত্র প্রদান কর? কিন্তু কি দুর্ভাগ্য এত আরাধনায়ও রাজা পুত্র সন্তানের মুখ দর্শন করতে পেলেন না। মনে খুবই কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন। তবুও নিরাশ না হয়ে অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে দেবী পুজায় বিরত হলেন না।

মন্ত্রীবর অন্ধকের পরামর্শে একদিন রাজা নিয়মিত দেবী পূজার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দেবী স্তব করতে লাগলেন—দেবী! তুমি ত্রিলোকজননী ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতারা তোমার আরাধনা করেন। তুমি সর্বজীবের মনের ইচ্ছা পূরণ কর ; যখন যেখানে তোমার ভক্তরা বিপদে পড়ে তোমার স্মরণ নেয় তুমি তাদেরই বিপদ থেকে উদ্ধার কর। আজ আমি তোমার পরম ভক্ত তোমার স্মরণ নিয়েছি, আমার মনের একটিমাত্র ইচ্ছা পূর্ণ কর।

ভক্তের আকুল প্রার্থনা শুনলেন। দেবী আকাশবাণীতে বললেন, আমি তোমার ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তোমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ কর ; তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

রাজা আকাশবাণীতে সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, যদি ভক্তের প্রতি কৃপা করতে চাও তবে এই বর দাও আমি যেন অবিলম্বে পুত্রের মুখ দেখে নিজের জীবনকে সার্থক করতে পারি।

দেবী বললেন, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তুমি পুত্র লাভ করবে এবং সেই পুত্র শান্ত স্বভাব, সর্বগুণসম্পন্ন এবং সব বিষয়ে পারদর্শী হবে।

যথাসময়ে রাজা পুত্র লাভ করলে রাণী এবং রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসে দেবীর পূজা দিলেন।

দীনদাস নামে এক তাঁতীর ছেলে বন্ধুর সঙ্গে রাজধানীতে এসেছিল। ঘটনাচক্রে তারই নিজ জাতির এক পরমাসুন্দরী ও লাবণ্যময়ী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে খুবই আনন্দিত হল। কিন্তু সেই কন্যা চোখের আড়াল হলে সেই তাঁতীর ছেলে মনে মনে ভাবল, আমাদের রাজা পুত্রহীন হওয়ায় দেবী কাত্যায়নীর কৃপায় বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র লাভ করেছেন। দেবীর কৃপা পেলে আমিও ঐ সুন্দরী কন্যাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে সুখী হতে পারি।

যা ভাবা তাই কাজ। দীনদাস মন্দিরে ঢুকে দেবীর কাছে ভক্তিচিত্তে প্রার্থনা করে বললো, দেবী ! যদি তোমার কৃপায় আমি ঐ কন্যাকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে পারি তবে নিজ হাতে আমার মাথা কেটে পূজা দেব। এই মানসিক করে দীনদাস বন্ধুর সঙ্গে ঘরে ফিরে এল। কিন্তু মনে শান্তি নেই, সব সময় সেই কন্যার চিন্তায় কাটে ; কোন কাজে উৎসাহ নেই। সব সময় সেই কন্যার চিন্তা।

দীনদাসের বন্ধু খুবই চিন্তায় পড়ল। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে বন্ধুর বাবাকে সব কথা খুলে বললো। সব শুনে এবং নিজের

চোখে এর সত্যতা যাচাই করে দীনদাসের বাবাও চিন্তা করতে লাগল এবং মনে মনে ঠিক করল সেই কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিয়ে না দিলে পুত্র হয়ত মারা যাবে। এই ভেবে সময় নষ্ট না করে পুত্রের বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কন্যার বাবার সঙ্গে দেখা করল এবং কন্যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করল। অল্পদিনের মধ্যে বিয়েও হয়ে গেল।

দীনদাস প্রচুর যৌতুক পেল বিয়েতে এবং মনের মত স্ত্রী পেয়ে সুখে দিনগুলি কাটাতে লাগল। দেবীর কাছে শপথের কথা ভুলে গেল।

কিছুদিন পর বন্ধু ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এল দীনদাস। দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরের কাছে উপস্থিত হলে সেই পূর্বের শপথের কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাবতে লাগল, আমি অসত্যবাদী এবং পাপী,দেবীর কাছে আমার শপথের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। যে পাপ করেছি তার থেকে নিস্তার নেই। যা হোক, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, এখনই পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করে দেবীকে তুষ্ট করতে হবে।

স্ত্রী ও বন্ধুকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দীনদাস মন্দিরের ভিতর ঢুকে প্রথমে ভক্তিসহকারে দেবীর পূজা করল তারপর দেবীর উদ্দেশ্যে বললো, দেবী! তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা আমি ভুলে গিয়ে যে পাপ করেছি তার জন্য যে শাস্তি হয় আমাকে দেবে তবে আজ এখনই আমার মানসিক শোধ করছি। এই কথা বলে মন্দিরের খড়্গ দিয়ে নিজ হাতে নিজের মাথা কেটে ফেলল।

দীনদাসের আসতে দেরী হচ্ছে দেখে তার বন্ধুর স্ত্রীকে বললো, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি দেখে আসি বন্ধু এতক্ষণ ধরে কি করছে।

মন্দিরে ঢুকে বন্ধু যে দৃশ্য দেখল তাতে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল সে। পরে ভাবল—এখন উপায়! সংসার বড়ই কঠিন স্থান, কেউ বিশ্বাস করবে না যে দীনদাস নিজেই এত কাজ করেছে। লোকে

ভাববে বন্ধুর স্ত্রীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে আমিই এই হীন কাজ করেছি। এমন অপবাদ শোনার থেকে মৃত্যু অনেক ভাল। বন্ধুর পথকেই আমাকেও বেছে নিতে হবে। এই কথা চিন্তা করে সেও নিজের হাতে খড়্গ দিয়ে মাথা কেটে ফেলল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও দুই বন্ধু ফিরে আসছে না দেখে বিরক্ত হয়ে দীনদাসের স্ত্রী মন্দিরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখল তাতে তার বুদ্ধি লোপ পেল এবং কিছুক্ষণ দীনদাসের স্ত্রী মন্দিরের দরজা ধরে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। পরে কিছুটা সময় সব মনে মনে চিন্তা করল— আগের জন্মে হয়তো অনেক পাপ করেছিলাম তাই এই দৃশ্য দেখতে হল। এখন আমি কি করি, আমার সামনে এখনো সারাটা জীবন পড়ে আছে, এই দীর্ঘদিন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াই ভাল। তাছাড়া পাঁচজনে আমাকেই সন্দেহ করবে। বলবে, এই দুশ্চরিত্রা নিজের স্বার্থে স্বামী ও তার বন্ধুকে খুন করেছে।

এই ভেবে সেই রক্তকলঙ্কিত খড়্গ তুলে নিয়ে নিজের মাথাটি কেটে ফেলতে উদ্যত হতেই দেবী তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার হাতটি ধরে বললেন, বৎসে। আমি তোমার সাহস এ সংকল্প দেখে খুবই খুশি হয়েছি, তুমি যা করতে যাচ্ছ তা থেকে নিরস্ত হও এবং আমার কাছে বর চাও।

সে বললো, জননি! যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র করুণা থাকে তবে এই মুহূর্তে এই দুই মৃতের দেহে প্রাণ দান কর।

দেবী হেসে বললেন, বেশ, তাই হবে। তুমি নিজের হাতে এই দুজনের মাথা ও দেহ একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দাও! এই বলে দেবী সেখান থেকে অন্তহিত হলেন।

তাঁতীর মেয়েটি তখন এই বর পেয়ে এত পুলকিত ও আনন্দিত হল সে তাড়াতাড়িতে একজনের মাথা অন্যজনের দেহে লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রাণ ফিরে পেয়ে উঠে বসলো।

এইরূপে উপাখ্যান শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা

করল—তা মহারাজ! এখন ছ'জনের ভেতর কে ঐ কন্যার স্বামী হবে? রাজা বললেন—যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা উত্তম, পাহাড়ের মধ্যে সুমেরু উত্তম, বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরু উত্তম, সেইরূপ সমুদয় অঙ্গের মধ্যে মাথাই উত্তম। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ মাথার নাম উত্তমাঙ্গ রেখেছেন। অতএব যার কলেবরে পূর্ব স্বামীর মাথাটি যোগ হয়েছে সেই ন্যায়সঙ্গত স্বামী হবে।

বেতাল সঠিক উত্তর পেয়ে রাজাকে ছেড়ে আবার গাছে গিয়ে উঠলো আর রাজা বিক্রমাদিত্যও আবার তাকে গাছ থেকে নামিয়ে পিঠে নিয়ে চলতে লাগলেন।

বেতালও তার সপ্তম গল্প আরম্ভ করল।



সপ্তম উপাখ্যান

বেতাল বলল—মহারাজ—চম্পানগরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর মহিষীর নাম সুলোচনা ও ত্রিভূবন সুন্দরী বলে তাঁর পরম রূপবতী এক রাজকুমারী ছিল। রাজকুমারী ত্রিভূবন সুন্দরীর বিয়ের সময় হল, রাজা তার পাত্রের অন্বেষণ করতে লাগলেন। রাজকুমারীর অপরূপ রূপ রাশির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা দেশের রাজা নিজেদের প্রতিমূর্তি চিত্রিত করে চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠালেন।

কিন্তু রাজকুমারীর কাকেও পছন্দ হয় না। অগত্যা রাজা রাজকুমারীর স্বয়ংবরের আদেশ দিলেন। সে তাতেও সম্মত না হয়ে বলল বাবা! আমার স্বয়ংবরের কোন আবশ্যক হবে না। যিনি বল বিক্রম ও বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হবেন আমি তাঁর গলাই বরমাল্য অর্পণ করবো।

কিছুদিন পর দূরদেশ থেকে চারজন যুবক রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হল। রাজা তাদের নিজ নিজ গুণের পরিচয় দিতে বললেন।

প্রথমজন বললো—মহারাজ, ছোটবেলা থেকে বহু যত্ন ও পরিশ্রমে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছি আমি। তাছাড়া আমার

একটি বিশেষ গুণ জানা আছে যার সাহায্যে প্রতিদিন একখানি কারুকার্য করা কাপড় বুনে পাঁচটি রত্নের বদলে বিক্রি করে একটি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিই, একটি দিই দেবতাকে, একটি আমি নিজের গায়ে পরি, আর একটি যত্ন করে রেখে দিই,—আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে সেই ভাবী স্ত্রীর জন্য। আর শেষটি খরচ করে আমার বেশ ভাল-ভাবেই চলে যায়। এমন গুণ আর কারো আছে বলে আমার মনে হয় না।

দ্বিতীয়জন বললো—আমি সমস্ত পশুপাখিদের ভাষা জানি; আমার মত শক্তিশালী পুরুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয়জন নেই।

তৃতীয়জন বললো—আমার মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর একজনও নেই। এমন কোন শাস্ত্র নেই যা আমার জানা নেই।

চতুর্থজন বললো—আমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর আমার একটি বিশেষ গুণ—আমি শব্দভেদী বাণ মারতে পারি। এমন গুণের অধিকারী আর কাউকে পাবেন না।

চারজনের গুণের কথা শুনে রাজা চন্দ্রাপীড় বিস্মিত হলেন এবং মনে মনে চিন্তা করলেন পাত্র হিসাবে চারজনই তাঁর মেয়ের উপযুক্ত কিন্তু এদের মধ্যে সেই একজন কাকে নির্বাচন করি যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়।

অবশেষে রাজা নিজে কিছু ঠিক করতে না পেরে ত্রিভূবনসুন্দরীর কাছে গিয়ে চারজন পাত্রের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন।

সব শুনে ত্রিভূবনসুন্দরী লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল, কোন জবাব দিল না।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, বল মহারাজ, তোমাকে যুক্তি দিয়ে বলতে হবে কে ত্রিভূবনসুন্দরীর মনের মত স্বামী হতে পারে।

রাজা বললেন.যে বস্ত্র নির্মান করে বিক্রয় করে সে জাতিতে শূদ্র। যে ব্যক্তি পশু পক্ষীর ভাষা আয়ত্ত করেছে সে জাতিতে বৈশ্য। যে

সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে শব্দভেদী বান মারতে শিখেছে সে রাজার স্বজাতীয়। শাস্ত্র এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এই পাত্রই রাজকন্যার উপযুক্ত।

রাজার যুক্তি শুনে বেতাল তাঁর কাঁধ থেকে নেমে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠলো, আর রাজাও নাছোড়বান্দা, তিনি তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

বেতালও তার অষ্টম গল্প আরম্ভ করল।



অষ্টম উপাখ্যান

বেতাল কহিল মহারাজ ! মিথিলা নগরে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। নাম তাঁর গুণাধীপ। রাজা গুণাধীপের সরলতা ও সদ্‌গুণের কথা শুনে চিরঞ্জীব নামে এক রাজপুত্র রাজকার্যের আশায় রাজ বাড়ীতে উপস্থিত হল। কিন্তু তার ছুরা দৃষ্ট, রাজা সব সময়ে রাজসভায় আসতেন না, অন্তঃপুরেই কাল যাপন করতেন। চিরঞ্জীবের এক বৎসর কেটে গেল রাজদর্শন আর হ'ল না।

এদিকে তার সব টাকাকড়ি ফুরিয়ে এল। চিরঞ্জীব মনে মনে ভাবতে লাগল, রাজা কতদিনে বাইরে আসবেন তার কোন ঠিক নেই। এরপর ভিক্ষা করে খেতে হবে। কিন্তু আমার মত শক্ত-সমর্থ এক-জন পুরুষের পক্ষে ভিক্ষা করা খুবই কষ্টকর, এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল। রাজা ভিন্ন অন্য কে আমাকে চাকরি দেবে। কিন্তু রাজার উপর নির্ভর করে কতদিনই বা এখানে থাকা সম্ভব। আশার ছলনায় ভুলে এই হীন জীবন যাপন করার চেয়ে বনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করা অনেক ভাল। এই ভেবে আর সময় নষ্ট না করে সে মিথিলা ত্যাগ করে বনে চলে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রাজা গুণাধিপের আমোদ-আহ্লাদের শখ মিটে যাওয়ায় রাজঅন্তঃপুর ত্যাগ করে পুনরায় রাজকার্যে মন দিলেন।

এরপর একদিন সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে রাজা শিকার করতে বনে প্রবেশ করলেন। নানা স্থান ঘুরে একটা হরিণের পিছু ধাওয়া করে বনের গভীরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে কেউ ছিল না।

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। হরিণও অন্ধকারে পালিয়েছে। শিকারের পিছনে ধাওয়া করায় এতক্ষণ কিছুই খেয়াল ছিল না। কিন্তু এখন তিনি ভয় পেলেন। সারা দিন বনে বনে ঘুরে খিদেয় তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়লেন। শরীর আর বইছে না। অথচ কাছে কোথাও জলাশয় নেই। কিছুটা চলার পর ঐ বনের মধ্যে এক কুটীর দেখে তিনি খুব খুশি হলেন, তাঁর আশা হল নিশ্চয় ওখানে গেলে মানুষের দেখা পাওয়া যাবে।

কুটীরের সামনে গিয়ে দেখলেন একজন তপস্যা করছেন। রাজা হাত জোড় করে তার কাছে জল চাইলেন। এই তপস্বী আর কেউ নয়,—সেই রাজপুত বীর চিরঞ্জীব।

চিরঞ্জীব রাজাকে সাদরে বসতে দিয়ে জল ও ফলমূলাদি এনে দিলেন খিদা মেটাবার জন্য।

রাজা যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেলেন।

রাজা চিরঞ্জীবকে বললেন, আপনি আজ আমার প্রাণ বাঁচালেন। আমি আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। আপনার ব্যবহার দেখে আপনার তপস্বী মনে হলেও আপনার চেহারা এবং স্বভাব দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে, আপনি আমার এই সন্দেহ দূর করতে প্রকৃত ঘটনা অকপটে বললে আমি কৃতার্থ হই। আপনি আমাকে বলুন, কে আপনি ? কেন এই গভীর বনে বসে একা একা তপস্যায় দিন কাটাচ্ছেন ?

চিরঞ্জীব রাজার অনুরোধ ফেলতে না পেরে সব খুলে বললো।

শুনে রাজা বড়ই লজ্জা পেলেন। কিন্তু তখনই নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে সেই রাতটি সেখানে সেই কুটীরেই কাটালেন।

পরদিন সকালে রাজা নিজের পরিচয় দিয়ে চিরঞ্জীবকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। তিনি চিরঞ্জীবকে প্রিয়পাত্র হিসাবে নিজের কাছে রাখলেন। চিরঞ্জীবও রাজার খুবই অনুগত ও বিশ্বাসী হয়ে উঠল।

একবার রাজা বিশেষ কারণে চিরঞ্জীবকে বিদেশে পাঠালেন। সে রাজার প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে ফেরবার পথে সমুদ্রের ধারে একটি অপূর্ব মন্দির দেখে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলো। দেবীকে প্রণাম করে ফেরার মুখে এক পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখে চিরঞ্জীব মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখতে লাগল।

চিরঞ্জীবের এই অবস্থা দেখে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো, হে বীর তোমার এখানে আসার কারণ কি?

উত্তরে চিরঞ্জীব তাকে সত্য ঘটনা বললো।

মেয়েটি বললো, তুমি এই সমুদ্রে ডুব দিয়ে ওটার পর আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব।

চিরঞ্জীব মেয়েটির কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তার কথা মত ডুব দিয়ে উঠেই দেখে—আশ্চর্য! কোথায় মন্দির আর কোথায় সেই সুন্দরী! এ যে তারই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

যাই হোক, সে ভিজে কাপড় ছেড়ে যথাসময়ে রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বললো।

রাজা এই অলৌকিক কাহিনী শুনে বললেন, এই অদ্ভুত ব্যাপারটা আমি নিজের চোখে দেখতে চাই, তুমি এখনই আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

যথাসময়ে দুইজন সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই মন্দিরে প্রবেশ করে দেবীকে ভক্তিসহকারে পূজা দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে সেই একই দৃশ্য দেখলেন।

রাজা গুণাধিপ সুপুরুষ ছিলেন। সেই পরমা সুন্দরী মেয়েটি রাজাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে এসে বললো, মহারাজ, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি তাই করব।

রাজা বললেন, তুমি যদি আমার কথা শোন তবে আমার প্রিয়-পাত্র চিরঞ্জীবকে বিয়ে কর।

এই কথা শুনে মেয়েটি বললো, মহারাজ, আমি আপনার রূপ ও

গুণে মুগ্ধ হয়েছি, অন্যকে বিয়ে করব কি করে?

রাজা বললেন, তুমি অঙ্গীকার করেছ, আমার আদেশ মেনে চলবে। যাঁরা সৎ লোক তাঁরা প্রাণ দিয়েও প্রতিজ্ঞা পালন করেন। কাজেই আমি আশা করব তুমি আমার কথার অমত করবে না।

রাজার এই কথার পর মেয়েটি সম্মত হল এবং রাজা তাদের গন্ধর্ব মতে বিয়ে দিয়ে রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং তাদের সব-রকম সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, রাজা আর চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশী মহৎ ও উদার?

বিক্রমাদিত্য বললেন, চিরঞ্জীবই বেশী মহত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়েছে।

বেতাল বললো, কেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, রাজা শেষ দিকে চিরঞ্জীবের নানা উপকার করেছেন সত্য, কিন্তু চিরঞ্জীব শিকারের দিনে রাজার সেই মুমূর্ষ অবস্থায় ফল, জল ও আশ্রয় দিয়ে রাজার যে পরম উপকার করেছিল তার তুলনা হয় না।

রাজার কাছ থেকে সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল আবার চলে গেল গাছে ঝুলতে, আর রাজা বিক্রমাদিত্যও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে তুলে সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে চললেন।

বেতালও নবম গল্প আরম্ভ করলো।



নবম উপাখ্যান

বেতাল কহিল মহারাজ! মগধ পুরনগরে বীরবর নামে এক রাজা ছিলেন। হিরণ্যদত্ত নামে তাঁর রাজ্যে এক ধনবান বণিক বাস করত। ঐ বনিকের মদনসেনা নামে পরমাসুন্দরী একটি কন্যা ছিল। বসন্ত উৎসবের দিনে মদনসেনা তার সঙ্গীদের বনভ্রমণে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় সোমদত্ত নামে এক বণিক পুত্রের সঙ্গে তার হঠাৎ সাক্ষাৎ হলো। সোমদত্ত মদনসেনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। এবং মদনসেনার সম্মুখে গিয়ে বলল—আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তুমি আমাকে বিয়ে করে আমার মনের বাসনা পূর্ণ করে অমাকে সুখী কর। যদি আমার এই কাতর প্রার্থনা পূর্ণ না কর তবে আমি তোমার সামনেই আত্মঘাতি হব।

মদনসেনা শুনে খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়ল এবং সোমদত্তকে অনেক করে বোঝাতে লাগল। অনেক সত্নপদেশও তাকে শান্ত করতে পারল না।

কোমলস্বভাবা মদনসেনা একজন যুবকের প্রাণ রক্ষা করা প্রধান ধর্ম মনে করে তাকে বললো, পাঁচদিন পর আমার বিয়ে! তবে কথা দিলাম শ্বশুড়বাড়ি যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি স্বামীর সঙ্গে মিলিত হব না।

মদনসেনার কথায় কিছুটা শান্ত হয়ে সে বাড়ির দিকে রওনা হল।

নির্দিষ্ট দিনে মদনসেনার বিয়ে হল। রাতে আত্মীয়েরা চলে গেলে মদনসেনা শয়নগৃহে প্রবেশ করল। সে নিজ কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে খাটের একপাশে চুপ করে বসে রইল। তার স্বামী তাকে আদর করতে গেল কিন্তু মদনসেনার দিক থেকে কোন সাড়া নেই।

তার স্বামী যখন মদনসেনার ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে উঠেছে তখন সে সোমদত্তর ঘটনা খুলে বললো তাকে। বললো, প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

একথা শুনে মদনসেনার স্বামী প্রথমে আপত্তি করলেও পরে মত দিল। বললো, না যেয়ে যখন ছাড়বে না, তখন যাও। কথা যখন দিয়েছ তখন কথা রাখাই উচিত।

মদনসেনা স্বামীর অনুমতি পেয়ে সেই মাঝরাত্রেই বিয়ের এক-গা-গয়না পরেই সমস্ত গা কাপড়ে ঢেকে সোমদত্তের বাড়ির পথে চলল।

এক চোর তার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার কি ভয়-ডর নেই? এক-গা গয়না পরে একা এই অন্ধকার রাতে পথে বেরিয়েছ? এখনই গয়নাগুলো খুলে আমাকে দাও।

মদনসেনা ভয় পেয়েছে কিন্তু সে ভাব বাইরে প্রকাশ না করে বললো, বণিক হিরণ্যদত্তের মেয়ে আমি। স্বামীর অনুমতি নিয়ে সোমদত্তের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ি যাচ্ছি প্রতিজ্ঞা পালন করতে।

চোর সব কথা শুনে তার গা থেকে গয়নাগুলো খুলতে উদ্যত হলে ব্যাকুল হয়ে হাতজোড় করে মদনসেনা বললো, ভাই, এইসব গয়না আমি তোমাকেই দেব প্রতিজ্ঞা করছি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আমার প্রতিজ্ঞা পালন করে ফিরে আসি আগে।

মদনসেনার কথায় বিশ্বাস করে চোর তাকে ছেড়ে দিয়ে তার ফিরে আসার অপেক্ষায় সেখানে বসে রইল।

মদনসেনা সোমদত্তের ঘরে ঢুকে দেখে সোমদত্ত ঘুমিয়ে আছে। তাকে জাগিয়ে দিতেই সোমদত্ত এই গভীর রাতে তার ঘরে মদনসেনাকে দেখে খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এত রাতে কি ভাবে এলে ?

মদনসেনা মৃদু হেসে বললো, তোমাকে যে কথা দিয়েছিলাম সেই কথা রাখতেই আমি এসেছি। ভয় নেই, আমার স্বামীর অনুমতি নিয়েই এসেছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা।

সোমদত্ত কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, তুমি যে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য এতখানি কষ্ট স্বীকার করেছ এবং বিপদ আছে জেনেও তাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছ এ জন্য আমি খুবই খুশি। সব জেনেও তোমার স্বামী যে তোমাকে আমার কাছে আসতে দিয়েছে এতে তার মহত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আমি কোন পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করাকে পাপ মনে করি। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে তোমার স্বামীকে সুখী কর।

ইতিমধ্যে চোর বসে বসে ভাবছিল, মেয়েটি মিথ্যা স্তোকবাক্যে তাকে ভুলিয়ে চলে গিয়েছে, সে আর ফিরবে না। আমার মত মূর্খ এ জগতে আর একজনও নেই যে গল্পকথায় বিশ্বাস করে। এমন সময় মদনসেনাকে ফিরে আসতে দেখে সে খুবই অবাক হল।

মদনসেনা তার ফিরে আসার বিলম্বের কারণ খুলে বললে চোর এই সত্যবাদিনী স্ত্রীলোকটির উপর খুশি হয়ে তাকে বললো, তোমার ব্যবহারে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার অলঙ্কারের উপর আর আমার কোন লোভ নেই, তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে সুখে শান্তিতে বাস কর।

মদনসেনার স্বামী কিন্তু মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি তার এই ব্যবহারে। তাই মদনসেনা তার স্বামীর কাছে ফিরে এলে স্বামী আর আগের মত তার সঙ্গে কোন কথা না বলে চুপ করে শুয়ে রইলো।

গল্প শেষ হতে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করল মহারাজ! এই চারজনের মধ্যে কে বেশী ভদ্র?

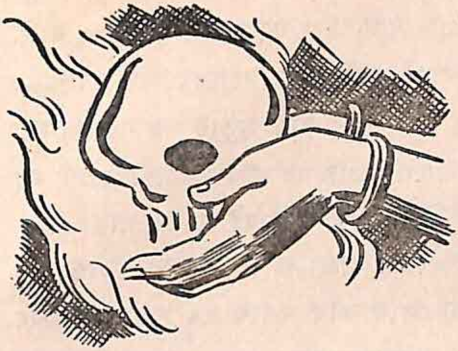
বিক্রমাদিত্য বললেন, "চোর"।

বেতাল বললো—কেন মহারাজ?

বিক্রমাদিত্য বললেন—মদনসেনার ভাবী স্বামী প্রথমে অনেক বাধা দিয়েছিল। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে অনুমতি দিল, এতে ভদ্রতাটা হ'ল কোত্থেকে! আর মদনসেনা সোমদত্তের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিল। সেকথা রক্ষা করা উচিত হলেও অন্যায় প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করলে কোন দোষ হয় না। সুতরাং ভাবী স্বামীর নিষেধ না মেনে অন্যায় প্রতিশ্রুতি পালন করতে যাওয়াটা মদনসেনার নির্দোষ কাজ হয় নাই। কিন্তু চোর অর্থপিশাচ। অর্থই তাদের সব। সে মদনসেনাকে হাতের মধ্যে পেয়েও—মদনসেনার সততায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অক্ষত বেশে ফিরিয়ে দিয়েছিল—এটা কি কম সহজ উদারতা।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল পুনরায় শ্মশানে গিয়ে সেই গাছে ঝুলে রইল আর বিক্রমাদিত্যও তাঁর যা কাজ তাই করলেন।

বেতালও তার দশম গল্প আরম্ভ করল।



দশম উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ !

গৌড়দেশে বর্ধমান নামে এক নগরে গুণশেখর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় গুণবান। তাঁর প্রধানমন্ত্রী অভয়চন্দ্র বিচক্ষণ ও বৌদ্ধধর্মী ছিলেন। মন্ত্রীকে রাজা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। রাজাও মন্ত্রীর উপদেশে বৌদ্ধধর্মী হলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, যাগযজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি শাস্ত্র মত কাজকর্ম বিসর্জন দিলেন। এবং রাজ্যমধ্যে ঘোষনা করে দিলেন আমার রাজ্যমধ্যে ঐসব কাজ করা চলবে না। কেউ ওসব করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

প্রজারা এতদিনের কুলাচার ও অনুষ্ঠান মন থেকে ত্যাগ করতে না চাইলেও শাস্তির ভয়ে ত্যাগ করল। ধর্মপ্রাণ যেসব প্রজা লুকিয়ে লুকিয়ে দেব-দেবীর পূজা করলে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো।

অভয়চন্দ্র রাজাকে বলতেন, মহারাজ ! ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা হল অহিংসা পরমধর্ম। সব ধর্মের উপরে অহিংসা ধর্ম। কোন লোক যদি এই জন্মে কাউকে হত্যা করে তবে পরের জন্মে সে তার প্রতিশোধ নেয় তাকে হত্যা করে। হিংসার জন্যই মানুষ সংসাররূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে। মানুষ কেন, দেবতারাও পাপকাজের জন্য সংসারে এসে অবতার হচ্ছেন। হাতির মত বিরাট দেহধারী প্রাণী থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র

পোকামাকড় সকল প্রাণেরই সমান মূল্য, তাই তাকে বিনাশ করা মহাপাপ। প্রতিটি প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করা মহৎ কাজ। পরের মাংস খেয়ে যারা নিজেদের দেহের মাংস বৃদ্ধি করে তাদের মত পাপী এ জগতে আর নেই। যারা এই কাজ করে তারা মৃত্যুর পর নরকে যেয়ে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে। মাংসের ন্যায় মদ খাওয়াও মহাপাপ। মদ এবং মাংস ত্যাগ করলে আয়ু বিদ্যা, বল, ধন সবই পাওয়া যায়।

এইভাবে উপদেশ দিয়ে অভয়চন্দ্র রাজাকে এমনভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করলেন যে কোন লোক তার কাছে বৌদ্ধধর্মের অশেষ গুণগান করলে তিনি তাকে পুরস্কৃত করতেন, এবং রাজার প্রিয়পাত্র হত। এইভাবে রাজার রাজত্বে প্রজারা বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রাণিত হল।

তারপর যথাসময়ে রাজার মৃত্যু হল। তাঁর ছেলে ধর্মধ্বজ রাজা হলেন। তিনি কিন্তু ছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থাবান। তিনি রাজা হয়েই বৌদ্ধদের শাস্তি দিতে লাগলেন। রাজমন্ত্রী অভয়চন্দ্রকে কঠোর শাস্তি দিলেন। তাঁর মাথা মুড়িয়ে, গাধায় চাপিয়ে সমস্ত নগর ঘুরিয়ে রাজ্যের বাইরে বের করে দিলেন। প্রজারা এতদিনে তাদের সনাতন হিন্দুধর্ম ফিরে পেল।

বসন্তোৎসবের দিনে রাজা ধর্মধ্বজ তাঁর তিন রাণীকে সঙ্গে নিয়ে উপবনে গেলেন আনন্দ করতে। সেই উপবনে সুন্দর একটি সরোবর ছিল। সরোবরে অনেক পদ্মফুল ফুটে ছিল। রাজা নিজে সরোবরে নেমে পদ্মফুল তুলে এনে রাণীদের দিলেন কিন্তু একটি ফুল এক রাণীর পায়ের উপর পড়ে গেলে তিনি এমন আঘাত পেলেন যে তার পা ভেঙ্গে গেল। রাণী বেদনায় কেঁদে উঠলেন। রাজা নানাভাবে তাঁর ব্যথা দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আকাশে পূর্ণ চাঁদ কিরণ দিচ্ছে। উপবন জ্যোৎস্নায় থৈ থৈ করছে। চাঁদের আলো গায়ে লেগে দ্বিতীয় রাণীর গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। তিনিও ব্যথায় কাতর।

সেই সময় কোন গৃহস্থের বাড়িতে হামাল দিস্তার শব্দে তৃতীয় রাণী

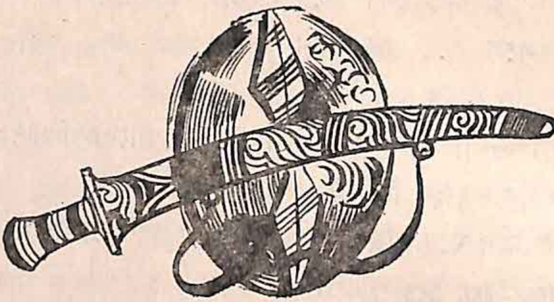
মূর্চ্ছা গেলেন।

এই অদ্ভুত গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল মহারাজ। তোমাকে বলতে হবে এই তিন রাণীর মধ্যে কার শরীর সবচেয়ে কোমল ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে চাঁদের কিরণ লেগে যে মহিষীর শরীর দগ্ধ হল তিনিই বেশী কোমল।

বেতাল মনে মনে রাজার বুদ্ধির প্রশংসা করে তাড়াতাড়ি আবার শিরীষ গাছে গিয়ে উঠে পড়ল।

রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। আর বেতালও তার একাদশ গল্প আরম্ভ করল।



একাদশ উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ ! পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে এক প্রজা-বৎসল রাজা ছিলেন। তাঁর মন্ত্রীর নাম সত্যপ্রকাশ। একদিন রাজা মন্ত্রীকে বললেন দেখ মন্ত্রী ! রাজরক্ষা বড়ই কঠোর কর্ম। এতদিন রাজ্য পরিচালনা করে আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমি বিশ্রাম করতে চাই। রাজা রাজবল্লভ সেদিন হতে মন্ত্রীর উপর রাজ্যের ভার দিয়ে ভোগ সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। অগত্যা মন্ত্রী সত্যপ্রকাশকে রাজকার্য চালাতেহ'ল। কিন্তু কঠোর রাজ্য পরিচালনার মন্ত্রীবর দিন দিন নিতান্ত শান্ত হয়ে পড়লেন।

নিজ গৃহে বসে তিনি একমনে এই সবই চিন্তা করছিলেন এমন সময় তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বামীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে বল ত ! সব সময়ই দেখি একাগ্র মনে কি ভাবছ ? আগে তো তুমি এমন ছিলে না।

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ তখন বললেন, তুমি তো জান, রাজা সব রাজকার্যের ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে জীবনকে উপভোগ করছেন, রাজ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই দেখছেন না কিন্তু আমার

পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

স্ত্রী বললেন, দেখ, রাজকার্য চালানো তোমার কাজ না, অনেক দিন তো চালালে, এবার এসব ছেড়ে কিছুদিন তীর্থে ঘুরে এস, শরীর মন দুই-ই ভাল হবে।

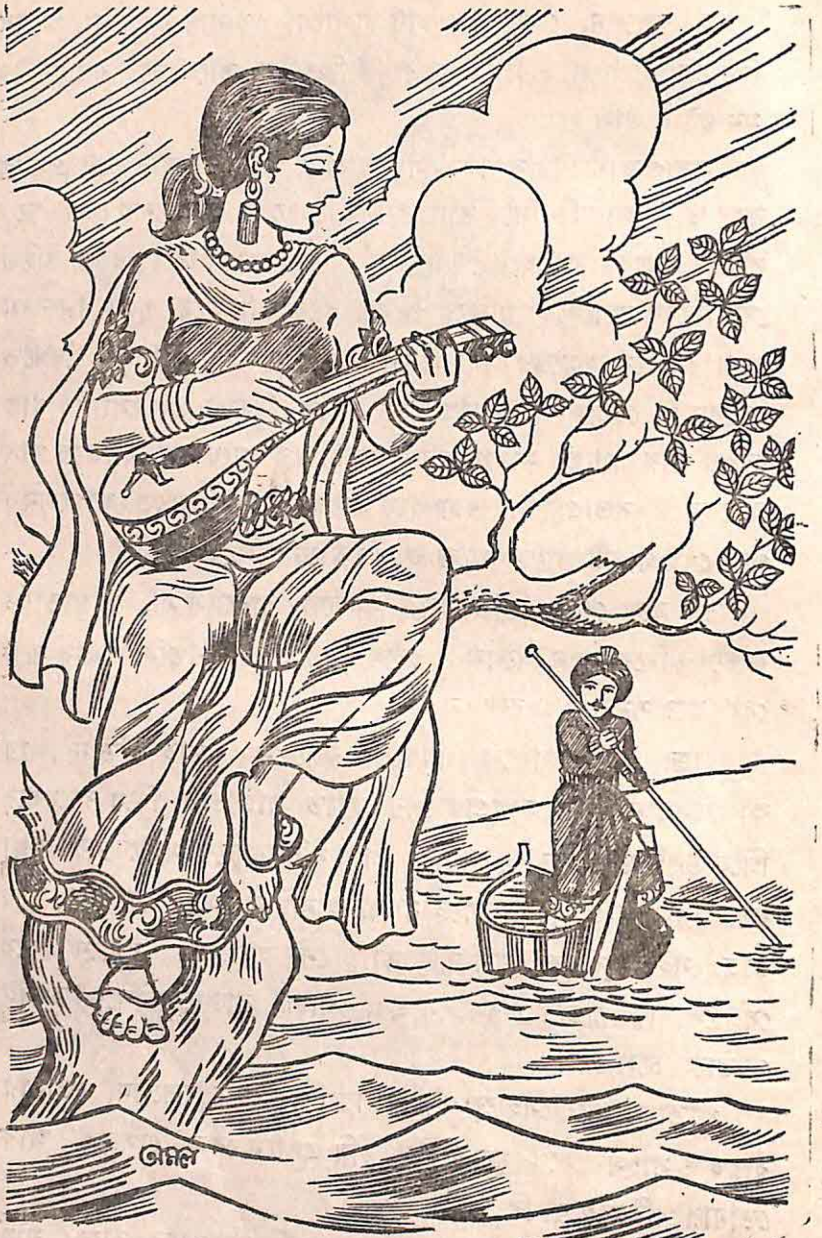
সত্যপ্রকাশ স্ত্রীর কথামত রাজার কাছে নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে তাঁর অনুমতি নিয়ে তীর্থ করতে বেরলেন! অনেক দেশ ঘুরে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে পৌঁছলেন। সেখানে রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করে ভক্তিভরে পূজা নিবেদন করে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলেন। দেখলেন সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিশাল এক সোনার গাছ বেরল আর গাছের মাথায় পরমাসুন্দরী এক মেয়ে বীণা বাজিয়ে গান করছেন। সত্যপ্রকাশ তন্ময় হয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলেন। পরে সেই গাছটি আস্তে আস্তে জলের নীচে তলিয়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে তিনি আর থাকতে পারলেন না, তাড়াতাড়ি স্বদেশের দিকে রওনা হলেন। দেশে ফিরে প্রথমেই তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কথা বললেন।

রাজা সত্যপ্রকাশকে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি আর কালবিলম্ব না করে সত্যপ্রকাশের হাতে রাজ্যভার দিয়ে রামেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে মন্দিরে ঢুকে মহাদেবের পূজা করে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের কাছে যা যা শুনেছিলেন সবই দেখলেন, তবে রাজা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি নৌকোয় করে সেখানে গিয়ে সেই সোনার গাছে উঠে বসলেন এবং গাছটি রাজাকে নিয়ে তখনই পাতালে চলে গেল।

পাতালে গিয়ে সেই সুন্দরী রাজার দিকে চেয়ে বললেন, তোমার বীরত্ব ও সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তুমি এখানে কেন এসেছ? আর তোমার পরিচয়ই বা কি?

রাজা তাঁর পরিচয় দিতে বললেন, আমি পুণ্যপুরের রাজা, নাম



"পরমাসুন্দরী একমেয়ে বীণা বাজিয়ে গান করছেন"—পৃঃ ৭৭

বল্লভ। তোমার রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়ে আমি এখানে এসেছি।

সুন্দরী মেয়েটি বললেন, তোমাকে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি, আমি তোমার স্ত্রী হতে পারি তবে একটি সর্তে, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে যদি আমার সংস্পর্শে না আস।

রাজা শুনে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন গন্ধর্বমতে দুজনের বিয়ে হল। দুজনে মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

কৃষ্ণাচতুর্দশীতে রাণী রাজাকে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে রাণীর কাছ থেকে দূরে চলে যেতে বললেন।

রাজাও কথা রাখলেন। কিন্তু চিন্তা করতে লাগলেন রাণী তাঁকে দিয়ে কেন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়ে এবং আজ এই কৃষ্ণাচতুর্দশীতে তাঁকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য কেনই বা রাণী অস্থির হল। রাজা এর কারণ জানবার জন্য বিশেষ কৌতূহলী হয়ে অন্ধকার রাত্রে হাতে তরবারি নিয়ে লুকিয়ে থেকে সব দেখতে লাগলেন।

ঠিক মাঝরাতে একটা রাক্ষস এসে রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করল। রাজা আর নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে রাক্ষসের সামনে উপস্থিত হয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ওরে দুরাচার রাক্ষস, তোর এতদূর স্পর্দ্ধা যে আমার রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করছিস? এই বলে হাতের তরবারি দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন।

রাণীর তখন আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছে। জলভরা চোখে রাণী তখন বললেন, তুমি আমাকে বাঁচালে। আমি এতদিন রাক্ষসের জন্য জীবন্মৃত হয়েছিলাম। এতদিন কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

রাজা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি এতদিন এত যন্ত্রণা সহ্য করেছ? আর তোমার প্রকৃত পরিচয়ই বা কি?

রাণী তখন বললেন, শোন তবে আমার সেই দুঃখের কাহিনী। আমি গন্ধর্বরাজ বিদ্যাধরের মেয়ে, নাম আমার রত্নমঞ্জরী। আমি বাবার আদরের মেয়ে ছিলাম। বাবা যখন খেতে বসতেন তখন

আমি কাছে না থাকলে তাঁর ভাল খাওয়া হত না। একদিন সখীদের সঙ্গে খেলায় এতই মেতে ছিলাম যে কখন বাবার খাওয়ার সময় হয়েছে তা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। বাবা আমার অপেক্ষায় থাকার পর ক্ষুধায় কাতর হয়ে এতই রেগে গেলেন যে আমাকে অভিশাপ দিলেন—আজ থেকে তোর বাসস্থান হবে পাতালে আর কৃষ্ণাচতুর্দশীতে এক রাক্ষস এসে তোকে নানাভাবে কষ্ট দেবে।

এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ শুনে আমি কাঁদতে কাঁদতে বাবার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বললাম, বাবা, আমার সামান্য ভুলের জন্য এবং সামান্য অপরাধের জন্য এমন কঠোর শাস্তি দিলেন, তবে বলে দিন কিভাবে আমি শাপমুক্ত হব?

বাবা আমার কাতর আবেদনে সাড়া দিলেন, এবং নিজেও বুঝলেন তাঁর স্নেহের কন্যার প্রতি কি অবিচার করেছেন। তিনি বললেন, তবে জেনে রাখ তোমার শাপমুক্তির উপায়। মহাবলশালী এক রাজা যেদিন ঐ রাক্ষসকে বধ করবেন সেইদিন তুমি শাপমুক্ত হবে।

আজ আমি শাপমুক্ত হলাম। এখন তোমার অনুমতি পেলে বাবার কাছে ফিরে যাই।

রজো বললেন, তুমি যদি আমার আজ্ঞাবহ হও এবং আমাকে ভালবাস তবে আগে আমার রাজধানীতে চল, পরে তোমার বাবার কাছে যাবে।

রত্নমঞ্জরী সম্মত হলেন এবং রাজা তাঁকে নিয়ে রাজধানীতে গিয়ে বেশ কিছুদিন আমোদ আহ্লাদে কাটাবার পর রাণীকে তাঁর বাবার কাছে যেতে অনুমতি দিলেন।

তখন রত্নমঞ্জরী বললেন, মহারাজ, দীর্ঘদিন মানুষের সঙ্গে বাস করে আমার গন্ধর্বত্ব চলে গিয়েছে, আমি এখন মানুষের মত হয়ে গিয়েছি। বাবা আমার গন্ধর্বদের রাজা। আমার মনে হয় আমি আর বাবার কাছে ফিরে গিয়ে সেই স্নেহ-ভালবাসা পাব না; সে দুঃখ আমার কাছে আরো বেদনাদায়ক হবে। তাই আমার ইচ্ছা

আমি এখানেই থেকে যাই।

রাজা এই কথা শুনে খুবই খুশি হলেন, তিনিও চাইছিলেন না রাণীকে যেতে দিতে।

মন্ত্রীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি আবার আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাতে লাগলেন।

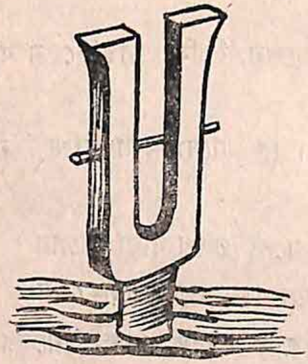
মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ এই সব দেখে শুনে মনের দুঃখে মারা গেলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল বললো, বল মহারাজ, মন্ত্রী মরলো কেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ ভাবল রাজা নিজের সুখেই যখন আত্মহারা তখন রাজকার্য্য আর পরিচালনা করবে কে? এই রূপ অবস্থায় প্রজাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আর কতদিন থাকতে পারে? এই সব দুশ্চিন্তায় তার দেহ মন ভেঙে যেতে লাগল, মৃত্যু তাকে সঙ্গী করে নিল।

মনের মত উত্তর পেয়ে বেতাল পুনরায় সেই গাছে গিয়ে ঝুলে রইলো আর রাজা বিক্রমাদিত্যও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে লাগলেন।

বেতালও তার দ্বাদশ গল্প বলতে আরম্ভ করলো।



দ্বাদশ উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ! চূড়াপুরে দেবস্বামী নামে এক পরম রূপবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বিদ্যায় বৃহস্পতি, সম্পদে কুবেরের মত ধনপতি ছিলেন। পরম রূপবতী নামে এক গুণবতী ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিয়ে করলেন। তার প্রশংসা পঞ্চমুখে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। দেবস্বামী মহানন্দে বাস করতে লাগলেন।

গ্রীষ্মকাল। ব্রাহ্মণ দম্পতি রাত্রে বাড়ীর ছাদের উপর ঘুমচ্ছেন—এমন সময় রথে উপবিষ্ট এক গন্ধর্বের দৃষ্টি পড়ল লাবণ্যবতীর উপর! গন্ধর্ব তার রূপে মুগ্ধ হয়ে রথ শুদ্ধ নেমে এসে ঘুমন্ত লাবণ্যবতীকে নিয়ে পালাল!

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর দেবস্বামীর ঘুম ভেঙে গেলে পাশে স্ত্রীকে না দেখতে পেয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাড়িময় অনেক খুঁজেও লাবণ্যবতীকে না পেয়ে মনের দুঃখে সে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলেন।

সকাল হলেই সমস্ত দিক ভাল করে খুঁজলেন কিন্তু স্ত্রীকে না পেয়ে পাগলের মত সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন।

একদিন দুপুরবেলা ক্ষুধায় কাতর হয়ে তিনি এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে কাতর স্বরে বললেন, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছি, আমাকে জল ও আহার

দিয়ে প্রাণ বাঁচান।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এই কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে এক বাটি দুধ এনে তাঁকে দিলেন।

এদিকে দৈবের বিধানে কিছুক্ষণ আগেই এক বিষধর সাপ ঐ দুধে মুখ দিয়ে খাওয়ায় ঐ দুধ বিষাক্ত হয়ে ছিল। ব্রাহ্মণ ঐ দুধ পান করামাত্র সেই বিষের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে বললেন, আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নাই, তবে কেন আমাকে বিষ খাইয়ে মারলে? বলতে বলতেই ব্রাহ্মণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা গেলেন।

ব্রাহ্মণ এইভাবে ব্রহ্মহত্যা হল দেখে খুবই দুঃখ পেলেন মনে এবং বাড়ির মধ্যে গিয়ে স্ত্রীই এর জন্য দায়ী ভেবে নির্দোষ স্ত্রীকে অনেক গালাগালি করে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

গল্প শেষ করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল মহারাজ, এদের মধ্যে কে দায়ী?

রাজা বললেন, সাপের মুখেতে বিষ আছেই, সুতরাং সাপের দোষ কি? গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কিছুই জানতেন না সুতরাং তাঁরাও নির্দোষ। আর অতিথি ব্রাহ্মণ যখন না জেনে দুধ পান করেছিল, তখন তারও আত্মহত্যার পাপ হয় না। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আনুপূর্বিক না জেনে বেচারী ব্রাহ্মণীকে মাঝখান হতে তাড়িয়ে দিলেন, অতএব এ ক্ষেত্রে কেবল তাঁরই দোষ।

বেতাল ঠিক উত্তর পেয়ে রাজার কাঁধ থেকে নেমে গাছে গিয়ে উঠলো আর রাজাও তাঁর যা কাজ তাই করলেন।

তখন বেতাল তার ত্রয়োদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।



ত্রয়োদশ উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ !

চন্দ্রহৃদয় নগরে রাজা রণধীর নামে এক প্রতাপশালী রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর মত সৎ ও হৃদয়বান রাজা খুব কমই দেখা যায়। তিনি যেমন হৃদয়বান ছিলেন তেমনি আবার কঠোরও ছিলেন কর্তব্যে। কিছুদিন পরে নগরে অত্যন্ত চোরের উপদ্রব হয়ে উঠল। রাজার কাছে এসে নালিশ করলে—রাজা বললেন যা হয়েছে তার ত কোন উপায় নেই, এবার হতে যাতে আর না হতে পারে তার চেষ্টা করব। প্রজারা চলে গেলেন।

রাজা প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদের নগরের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করে তাদের জানিয়ে দিলেন চোর চুরি করে যদি পালিয়ে যায় তবে সেই অঞ্চলে নিযুক্ত প্রহরীর প্রাণদণ্ড হবে।

প্রহরীরা এই কঠোর শাস্তির কথা শুনে খুবই সতর্ক হলো কিন্তু চুরি না কমে বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল।

প্রজারা পুনরায় রাজার কাছে গিয়ে তাদের নিজের নিজের দুঃখের কথা বললো। রাজা তাদের আরো কঠোর ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিলে তারা নিজ নিজ বাড়ি চলে গেল।

রাজা ঠিক করলেন তিনি নিজে নগর প্রহরার জন্য রাত্রে বের হবেন।

রাত্রির প্রথম প্রহরের পর রাজা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে নগর প্রহরায় বের হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর একজন অপরিচিত লোককে দেখে তিনি বললেন, তোমার পরিচয় কি বল, এতরাতে কোথায় যাচ্ছ?

চোর বললো, এত রাতে যখন বের হয়েছি তখন বুঝতেই পারছ আমি কে? আমার নাম চোর। চুরি করাই আমার কাজ। তা তুমি কে হে বাপু? তোমার পরিচয়টা এবার দাও?

রাজা বললেন, বুঝতে পারছ না আমি কে? আমিও তোমারই মত একজন চোর। একই উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়েছি।

তখন চোর খুশি হয়ে মনে মনে ভাবল, যাক, একজন সঙ্গী পাওয়া গেল! বললো, তবে চল একসঙ্গেই চুরি করতে যাই।

রাজা চোরের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

সেইদিন উভয়ে এক ধনীর গৃহে চুরি করে অনেক অর্থ হস্তগত করল। তারপর নগর থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে এক সুড়ঙ্গপথে পাতালে প্রবেশ করল। চোর রাজাকে বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে বলে বাড়িতে প্রবেশ করল।

এই সময় এক দাসী এসে কথায় কথায় রাজার পরিচয় পেয়ে বললো, মহারাজ, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তবে এখনই এখান থেকে চলে যাও, এই চোর এক দুর্দান্ত দস্যু।

রাজা এই কথা শুনে বললেন, আমি তো বাইরে যাবার পথ চিনি না, যদি তুমি আমাকে দয়া করে পথটা দেখিয়ে দাও তবে আমার প্রাণ বাঁচে।

তখন সেই দাসীর সাহায্যে রাজা প্রাসাদে ফিরে এলেন।

পরদিন রাজা রণধীর নিজে রণসাজে সজ্জিত হয়ে অনেক সৈন্য

নিয়ে সেই পাতালে প্রবেশ করে চোরের বাড়ি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললেন।

এক রাক্ষস এই পাতাল নগরীকে রক্ষা করতো। তার বিপদ বুঝে নগররক্ষক রাক্ষসের শরণাপন্ন হয়ে জানাল, এক রাজা সসৈন্যে আমার গৃহ আক্রমণ করেছে, এই বিপদে তুমি যদি আমার সহায় হও।

যদি আমাকে সাহায্য না কর তবে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব।

চোর এইকথা বলে রাক্ষসকে অনেক মূল্যবান উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করলো।

রাক্ষস সন্তুষ্ট হয়ে বললো, তোমার কোন ভয় নেই, এখনই আমি রাজার সব সৈন্যসামন্ত খেয়ে শেষ করে দিচ্ছি।

এই কথা বলে রাক্ষস সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজার সৈন্যসামন্ত, হাতি, ঘোড়া সব খেতে আরম্ভ করল। এই অবস্থা দেখে সৈন্যরা প্রাণভয়ে পালাতে লাগল।

রাজা এই অবস্থা দেখে তিনিও পালাতে আরম্ভ করলেন। রাক্ষসের সহায়তায় চোর সাহসী হয়ে রাজার পিছু ধাওয়া করল। রাজার কাছে এসে চোর রাজাকে তিরস্কার করে বললো, ওরে ক্ষত্রিয়, কুলের কুলাঙ্গার, রাজা হয়ে কাপুরুষের মত যুদ্ধ না করে পালাচ্ছিস ? তোর মত রাজার নরকবাস হবে।

তখন রাজা চোরের এই বিদ্রূপবাণ সহ্য করতে না পেরে প্রাণভয় তুচ্ছ করে চোরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন।

ভীষণ যুদ্ধ চললো দুজনের মধ্যে। অবশেষে রাজা চোরকে পরাজিত করে তাকে প্রাণে না মেরে বেঁধে নিয়ে এলেন রাজধানীতে।

বিচার করে শূলদানের আদেশ দিলেন রাজা। গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর ঘোরাতে লাগল প্রজারা।

কিন্তু ধর্মধ্বজ বণিকের কন্যা শোভনা ঐ চোরকে দেখে এমনই মুগ্ধ হলো যে সে তার বাবাকে জানাল, যেমন করে হোক ঐ চোরকে

মুক্ত করে আমার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা কর।

বণিক বললো, এ প্রস্তাবে রাজা কিছুতেই সম্মত হবেন না, কারণ এই চোরকে ধরার জন্য রাজার অনেক সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে, এমন কি রাজার প্রাণও চলে যেতে পারত।

শোভনা বললো, তোমার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়েও যদি ওকে মুক্ত করে আনতে পার তবে তাই কর। যদিও ওকে আনতে না পার তবে তোমার সামনে আমি আত্মঘাতী হব।

ধর্মধ্বজের প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় ছিল কন্যা শোভনা। একান্ত নিরুপায় হয়ে ধর্মধ্বজ রাজার কাছে আবেদন করল, মহারাজ, আমার একান্ত অনুরোধ, আমার সব সম্পত্তি নিয়ে ঐ চোরকে মুক্ত করে দিন।

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে রাজা বললেন, তোমার এই অদ্ভুত প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হওয়া যায় না ; এই চোর আমার প্রজাদের অনেক অনিষ্ট করেছে, আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করেছে। আমি কিছুতেই একে ছেড়ে দেব না।

তখন ধর্মধ্বজ গৃহে গিয়ে সমস্ত বিষয় কন্যা শোভনাকে বললো। শুনে শোভনা কাঁদতে লাগল।

যথাসময়ে চোরকে শূলস্তম্ভের কাছে এনে দাঁড় করান হল। ইতিমধ্যে শোভনার বিষয় সব নগর মধ্যে প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। চোরও এ বিষয়ে সব শুনে প্রথমে হাসল, তারপর হাসি থামিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। এই সময় রাজপুরুষরা তাকে শূলে চড়িয়ে দিল।

শোভনা চোরের মৃত্যু সংবাদ শুনে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয়ে চোরের সঙ্গে একই চিতায় মৃত্যুকে বরণ করে চিতায় আরোহণ করল।

এই চিতার পাশেই দেবী কাত্যায়নীর মন্দির ছিল। শোভনার নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে দেবী মন্দির থেকে শ্মশানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়েছি, বর চাও।

শোভনা বললো, দেবী, যদি আমায় কৃপা কর তবে এই চোরের জীবনদান কর।

দেবী তাই করলেন। অমৃত পান করিয়ে চোরের প্রাণদান করলেন।

বেতাল জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ! চোর প্রথমে কেন হেসেছিল এবং পরে কেন কেঁদেছিল?

রাজা বললেন, চোর ভাবল যে, এ কেমন অসম্ভব ব্যাপার! আমার মৃত্যুর সময় বণিক কন্যার ভালবাসা কেমন করে হ'ল? এই ভেবেই সে প্রথম হেসেছিল। তারপর যখন ভাবল যে, হায় আমার মৃত্যুর জন্য সে রাজাকে যথাসর্বস্ব দিতে চেয়েছিল দুর্ভাগ্য, আমি এমন কি তার উপকারে আসতাম! তখন সে নিতান্ত দুঃখে কেঁদেছিল।

আবার ঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল শ্মশানের সেই গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল আর রাজাও তাকে তখনই নামিয়ে কাঁধে নিয়ে আবার রওনা হলেন।

বেতালও তার চতুর্দশ গল্প আরম্ভ করল।



চতুর্দশ উপাখ্যান

বেতাল বলিল মহারাজ !

কুসুমবতীনগরে রাজা সুবিধানের এক অবিবাহিতা পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম চন্দ্রপ্রভা। একদিন রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা পিতার অনুমতি নিয়ে সহচরীদের নিয়ে রাজবাড়ীর কিছুদূরে এক মনোরম উপবনের মধ্যে বেড়াতে গেলেন। রাজার আদেশ ছাড়া সে উপবনে কোন পুরুষ যেতে পারত না। দৈবযোগে মনস্বী নামে এক বিদেশী সুঠাম যুবক রৌদ্রতাপে অতিষ্ঠ হয়ে নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় ঐ উপবনের একটা নির্জন কুঞ্জের বৃক্ষছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল ! ব্রাহ্মণকুমার জানত না যে এই বনে কোন পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সে যখন উপবনের মধ্যে প্রবেশ করে কেউ তাকে দেখতেও পায় নি।

রাজকুমারী ও তাঁর সখীরা সেই ব্রাহ্মণকুমারের কাছে উপস্থিত হলে তাঁদের পায়ের শব্দে ও কথায় ব্রাহ্মণকুমারের ঘুম ভেঙে যায়। সামনেই অপরূপাকে দেখে মুগ্ধ হলেন যুবক। এমন সুন্দরী মেয়ে তিনি ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নাই।

রাজকুমারীও এমন রূপবান যুবক কখনও দেখেন নাই। চার চক্ষের মিলন হল। সখীরা রাজকুমারীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে রাজধানীতে চলে গেল।

ব্রাহ্মণকুমার এই বিরহ সহ্য করতে না পেরে সেইখানেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

সেই সময় শশী ও ভূদেব নামক দুই পথিক সেখানে পৌঁছলেন। তাঁরাও পথশ্রমে ক্লান্ত। তাঁরা কামরূপ থেকে বিদ্যাশিক্ষা করে দেশে ফিরছিলেন। তাঁরা যুবককে ঐ অবস্থায় দেখে ভূদেব তাঁর সঙ্গীকে বললেন, বল তো শশী এ এভাবে অচেতন হয়ে পড়ে আছে কেন? জ্ঞান আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

শশী বললেন, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলেই এর জ্ঞান ফিরে আসবে, তখন জেনে নেওয়া যাবে কারণটা কি।

এই কথা বলে দুজনে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে এনে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

যুবক বললেন, সেকথা শুনে আর কি লাভ ভাই, তোমরা আমার এই দুঃখ দূর করতে পারবে না। মাঝখান থেকে আমার কথা শুনে আমাকে উপহাস করবে।

ভূদেব বললেন, তুমি আমাকে সমস্ত খুলে বল, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যেমন করে পারি তোমার দুঃখ দূর করব।

তখন মনস্বী তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। বললেন, কিছুক্ষণ আগে এক অপরূপা সুন্দরী এই উপবনে বেড়াতে এসেছিল, তার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়েই আমার এই অবস্থা হয়েছে। তাকে না পেলে আমি প্রাণে বাঁচব না।

ভূদেব বললেন, তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করো না, এখন আমার সঙ্গে চল। তুমি যাতে তাকে পাও তার সব ব্যবস্থা আমি করছি। যদি অকৃতকার্য হই তবে তোমাকে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে বিদায় দেব।

যুবক বললেন, যদি আমি তাকে আমার স্ত্রীরূপে না পাই তবে অর্থের আমার প্রয়োজন নেই।

ভূদেব হেসে বললেন, অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আমাদের সঙ্গে চল।

নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভূদেব তাঁকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, এই মন্ত্রের এমন গুণ, এই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে

সঙ্গে তুমি এক যুবতীতে পরিণত হবে, আবার ইচ্ছা করলেই নিজের ষোল বছরের স্বরূপ প্রাপ্ত হবে।

তখন মনস্বী মন্ত্রপ্রয়োগে ষোল বছরের এক সুন্দরী কন্যা হয়ে গেলেন।

ভূদেব হলেন আশী বছরের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। মনস্বীকে বধূর বেশে সাজিয়ে রাজা সুবিধানের কাছে উপস্থিত হলেন!

রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করে সম্মানের সঙ্গে বসতে বললেন।

ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্বাদ করে আসন গ্রহণ করলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু কোথা থেকে আসছেন?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ভূদেব বললেন, মহারাজ! আমার সঙ্গে যাকে দেখেছেন এ আমার পুত্রবধূ। তাকে তার বাপের বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি গ্রামে ওলাওঠা দেখা দেওয়ায় আমার ব্রাহ্মণী ও ছেলে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। কোথায় আছে জানি না। তাদের খুঁজতে দেশে দেশে ঘুরতে চাই। কিন্তু পুত্রবধূকে কোন বিশ্বস্ত লোকের হাত না দিয়ে যেতে পারলে বিদেশে গিয়েও শান্তি পাব না। চিন্তা করে দেখলাম, আপনি দেশের রাজা, আপনার মত বিশস্ত আর কে আছে, তাই আমার একান্ত বিনীত অনুরোধ, আমার এই পুত্রবধূকে আপনি আশ্রয় দিয়ে আপনার কন্যার ন্যায় আপনার অন্তঃপুরে রাখুন। ফিরে এসে আমার বৌমাকে নিয়ে যাব।

রাজা এই প্রস্তাব শুনে মনে মনে ভাবলেন, পরের মেয়ে ঘরে রাখা সহজ কাজ নয়। কিন্তু অস্বীকার করলে ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, তাই ঠিক করলেন, কন্যা চন্দ্রপ্রভার সখী হিসাবে তাকে এই ভার দেওয়া যেতে পারে।

রাজা বললেন, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হলাম। রাজা হিসাবে এটা পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

ভূদেব রাজাকে আশীর্বাদ করে রাজার হাতে পুত্রবধূকে দিয়ে চলে

এলেন।

রাজকন্যা একজন সমবয়স্কা সঙ্গী পেয়ে খুশি হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের খুব ভাব হল। একসঙ্গে থাকা, এক বিছানায় শোয়া প্রভৃতির দ্বারা দুজনে দুজনকে ভালবেসে ফেলল।

একদিন রাজকন্যার মনের ভাব বুঝবার জন্য কথাপ্রসঙ্গে বললো, ভাই, তুমি সবসময় কি চিন্তা কর বল ত, চিন্তায় চিন্তায় তুমি ক্রমেই রোগা হয়ে যাচ্ছ।

তখন রাজকন্যা প্রাণের কথা খুলে বললেন, কিন্তু তাঁর নাম ঠিকানা কিছুই জানি না।

মনস্বী রাজকন্যার প্রাণের কথা শুনে উৎফুল্ল হলেন। তিনি রাজকন্যাকে বললেন, প্রিয় সখী! আমি যদি সেই ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে তোমার মিলন করিয়ে দিই তাহলে বল আমাকে কি পুরস্কার দেবে।

রাজকন্যা বললেন, যদি এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তবে চিরকাল আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব।

মনস্বী তখন মন্ত্রবলে আপন শরীরে আবির্ভূত হলে রাজকন্যা বিস্মিত হয়ে সমস্ত বিষয় জানতে চাইলেন!

ব্রাহ্মণযুবক মনস্বী তখন তাঁকে সমস্ত খুলে বললে গন্ধর্ব মতে তাঁদের বিয়ে হল।

এর কিছুদিন পর রাজকন্যা সন্তানসম্ভবা হলেন।

একদিন রাজা সুবিধান মন্ত্রীর বাড়ি সপরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। রাজকন্যা ব্রাহ্মণবধূরূপী মনস্বীকে চোখের আড়াল করতে পারতেন না। সে কারণ রাজকন্যা তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

মন্ত্রীপুত্র ব্রাহ্মণবধূর রূপলাবণ্যে এমনই মোহিত হলেন যে তিনি তার বন্ধুকে বললেন, যদি ঐ স্ত্রীরত্ন না পাই তবে আত্মহত্যা করব। তখন মন্ত্রীপুত্রের বন্ধু অন্য উপায় না দেখে মন্ত্রীকে সমস্ত বিষয় জানালেন।

মন্ত্রীও ছেলের কথা চিন্তা করে রাজাকে তাঁর পুত্রের অবস্থা

বললেন।

রাজা শুনে খুবই রেগে বললেন, এ আপনি কি মূর্খের মত কথা বলছেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রবধূকে বিশ্বাস করে আমার কাছে রেখে গিয়েছেন, তাঁর অনুমতি না নিয়ে এমন অন্যায় কাজ করা কিভাবে সম্ভব ? আপনার এ অন্যায় অনুরোধ প্রাণ গেলেও আমি রাখতে পারব না।

মন্ত্রী নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন এবং পুত্রের অবস্থা দেখে তিনিও আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন।

মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে রাজকার্য ঠিকমত চলছে না দেখে অন্যান্য রাজপুরুষেরা রাজাকে বললেন, মহারাজ, মন্ত্রীপুত্রের যা অবস্থা তাতে তিনি প্রাণে বাঁচবেন বলে মনে হয় না। যদি পুত্রের মৃত্যু হয় তবে মন্ত্রীও বাঁচবেন বলে মনে হয় না। আপনার মন্ত্রীর মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ দ্বিতীয় কেউ নেই, এই মন্ত্রী না থাকলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আমাদের একান্ত অনুরোধ, ব্রাহ্মণপুত্রবধূকে মন্ত্রীর গৃহে পাঠিয়ে দিন। ব্রাহ্মণ অনেক দিন দেশছাড়া, হয়তো আর না ফিরতেও পারেন। যদি ফিরে আসেন তখন যথেষ্ট অর্থের লোভ দেখালে তিনি আর আপত্তি করবেন না। ব্রাহ্মণরা সাধারণতই অর্থলোভী হয়। যদি অর্থে কাজ না হয় তবে ব্রাহ্মণপুত্রের অন্য কোন কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

রাজা অনেক ভাবনা চিন্তা করে ব্রাহ্মণবধূর কাছে গিয়ে মন্ত্রীপুত্রের প্রার্থনা জানালেন।

ব্রাহ্মণবধূরূপী মনস্বী বললেন, মহারাজ, আপনি দেশের রাজা, আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, বিশেষতঃ আমি এখন অসহায় অবস্থায় আপনার আশ্রয়ে আছি, আপনার আদেশ পালন করা আমার উচিত। কিন্তু মহারাজ ! আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন আমি বিবাহিতা নারী, বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের সেবা করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও নিন্দার বিষয়। আপনি সুবিচারক হয়ে এই অন্যায়

প্রস্তাব কিভাবে করছেন বুঝতে পারছি না। প্রাণ গেলেও আপনার আদেশ পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব না।

রাজা শুনে খুব বিষণ্ণ অন্তরে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন। মনস্বী ভাবলেন, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। এই ভেবে মন্ত্রবলে পুরুষবেশে রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেলেন।

এই খবর রাজার কাছে গেলে তিনি খুবই চিন্তায় পড়লেন। ব্রাহ্মণ এসে যখন তাঁর পুত্রবধূকে নিতে চাইবেন তখন তিনি কি করবেন। ব্রাহ্মণবধূর কাছে ঐ অন্যায় প্রস্তাব করা ঠিক হয় নাই।

মনস্বী রাজপ্রাসাদ থেকে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলেন ভূদেবের বাড়ি। সমস্ত শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। মনে মনে ভাবলেন ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছে।

বন্ধু শশীকে এক যুবা সাজিঁয়ে ভূদেব নিজে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে রাজার কাছে উপস্থিত হলেন।

রাজা পূর্বের মত আসন থেকে উঠে এসে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে ব্রাহ্মণকে বসতে অনুরোধ করে বললেন, আপনার ফিরতে এত দেরী হল কেন?

ভূদেব বললেন, অনেক কষ্টে পুত্রকে ফিরে পেয়েছি, এখন পুত্রবধূসহ নিজের বাড়ি ফিরে যাব।

রাজা ব্রহ্মশাপের ভয়ে কোন কথা না লুকিয়ে সব কথা সবিস্তারে ব্রাহ্মণকে বললেন।

ব্রাহ্মণ শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই কি রাজার কাজ হয়েছে? এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা কি কোন মানুষের উচিত কাজ?

রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার যে ক্ষতি আমি করেছি যে কোন মূল্যে তা প্ররিশোধ করতে আমি প্রস্তুত।

ভূদেব বললেন, বেশ, আপনার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের যদি বিয়ে দেন তবেই আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করা হবে।

রাজা নিরুপায় হয়ে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং শুভদিনে বিয়ে হয়ে গেল। ভূদেব রাজকন্যা নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলে শশী এবং মনস্বী দুজনেই রাজকন্যাকে নিজ স্ত্রীরূপে দাবী করলেন এবং পরস্পরে ঝগড়া করতে লাগলেন।

মনস্বী বললেন, একে আমি অনেকদিন আগেই গন্ধর্বমতে বিয়ে করেছি এবং আমার দ্বারা এর গর্ভসঞ্চার হয়েছে।

শশী বললেন, কোন কথা শুনতে চাই না। রাজা সকলের সামনে রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন, এই বিয়ে বৈধ, সুতরাং রাজকন্যা আমারই স্ত্রী।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, এখন বল মহারাজ! শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে এই রাজকন্যা কার স্ত্রী হওয়া উচিত।

বিক্রমাদিত্য বললেন, এর উত্তর খুব সহজ। মনস্বীর স্ত্রী হবে এই রাজকন্যা।

বেতাল বললে শাস্ত্রে বলে কন্যাদান বিক্রয় পরিত্যাগে পিতা-মাতার অধিকারী। রাজা সকলের সম্মুখে ধর্মসাক্ষী করে শশীকে কন্যা-দান করেছেন। অতএব পিতৃদত্ত কন্যা শশীরই স্ত্রী হতে পারে। তা না হয়ে মনস্বীর স্ত্রী কিরূপে হয় বল?

রাজা বললেন পূর্বে মনস্বীর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়েছে। এখন সে বেঁচে থাকাতে শাস্ত্র মতে আর সে কন্যার বিয়ে হতে পারে না। সুতরাং জেনে হোক না জেনে হোক রাজা যে শশীর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিয়েছেন তা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, এ বিয়ে হয় না। এখন রাজকন্যা মনস্বীর স্ত্রী হলে তার সতীত্ব রক্ষা হয়।

বেতাল খুশি হয়ে রাজার কাঁধ থেকে নেমে সেই গাছে গিয়ে উঠলো আর রাজাও পুনরায় তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলো।

বেতালও তার পঞ্চদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।



পঞ্চদশ উপাখ্যান

বেতাল বললে মহারাজ শোন—

ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতের উপরে পুষ্পপুর নামে এক রমনীয় নগর ছিল। গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু ঐ নগরের রাজা। তিনি অপুত্রক বলে বহুদিন ধরে কল্পবৃক্ষের পূজা করেছিলেন। কল্পবৃক্ষের পূজা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, রাজার আরাধনায় কল্পবৃক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে বর দেন—তোমার অতি সুন্দর পুত্র সন্তান জন্মাবে। যথাসময়ে জীমূতকেতুর এক সর্ব গুণবান পুত্র জন্মাল। তিনি তাঁর ছেলের নাম রাখলেন জীমূতবাহন। জীমূতবাহন ধর্মপ্রাণ, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সব শাস্ত্রে পারদর্শী ও অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুন হয়ে উঠলেন।

কিছুদিন পর জীমূতকেতু পুনরায় কল্পবৃক্ষের আরাধনা করে রাজ্যের প্রজাদের সব রকম সুখ সম্পদ চেয়ে নিলেন। কিন্তু এতে রাজ্যের মঙ্গল হল না। প্রজারা প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে কুঁড়ে ও অহঙ্কারী হয়ে উঠল। রাজাকেও মানতে চাইত না। রাজ্যে অরাজকতা দেখা দিল।

তখন রাজার কয়েকজন জ্ঞাতি পরামর্শ করল, রাজা ও রাজপুত্র সব সময় ধর্মকর্ম নিয়েই মেতে আছেন, এতে দেশের ক্ষতি হচ্ছে। রাজাকে রাজচ্যুত করতে হবে।

রাজাকে সরাবার জন্য প্রজাদের বলতে লাগল যে, এই রাজা প্রজাদের মঙ্গলের কথা মোটেই চিন্তা করছেন না, এঁকে অন্য কোন

উপযুক্ত লোককে রাজা করতে হবে।

প্রজারা তাদের কথায় বিশ্বাস করে রাজদ্রোহী হয়ে প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেললো।

প্রজাদের এই স্পর্ধা দেখে জীমূতবাহন রাজাকে বললেন, মহারাজ! জ্ঞাতিরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের রাজ্যচ্যুত করতে চাইছে, আপনি আজ্ঞা দিলে এদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করি।

জীমূতকেতু বললেন, ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের জন্য প্রাণী হত্যা করা মহাপাপ। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির আত্মীয়দের কুমন্ত্রণায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করে পরে অনেক অনুতাপ করেছিলেন। বরং রাজপ্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ের শান্ত কোন জায়গায় কুঁড়ে তৈরি করে দেবতার আরাধনা করায় অনেক শান্তি পাওয়া যাবে।

এরপর তাঁরা প্রাসাদ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন।

সেখানে এক ঋষিকুমারের সঙ্গে রাজকুমারের খুব বন্ধুত্ব হল। একদিন দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে কাত্যায়নীর মন্দিরের কাছে উপস্থিত হলে মন্দিরের ভিতর থেকে বীণার শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা বীণা বাজিয়ে দেবী কাত্যায়নীর স্তবগান করছেন।

উভয়ে একমনে এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর গান শেষ করে জীমূতবাহনকে দেখেই তাঁর ভাল লেগে যায় এবং মনে মনে তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করে নিয়ে সখীদের দিয়ে তাঁর নাম ও পরিচয় জেনে নিয়ে সেখান থেকে চলে যান।

এরপর তাঁরা সখী মার কাছে সমস্ত বিষয় বললে তিনি তাঁর স্বামী মলয়কেতুকে সব ঘটনা বলেন।

মলয়কেতু তাঁর ছেলে মিত্রাবসুকে ডেকে বললেন, তোমার বোনের বিয়ের বয়স হয়েছে। আর চুপ করে থাকা উচিত হবে না;

উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান কর। শুনলাম গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু ও তাঁর পুত্র রাজ্য ত্যাগ করে মলয় পর্বতে বাস করছেন। আমার নিজের ইচ্ছা জীমূতবাহনের সঙ্গে কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করি। জীমূতকেতুর সঙ্গে এবিষয়ে কথা বল।

মিত্রাবসু বাবার আদেশ মত জীমূতকেতুর সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বললে রাজা সম্মত হয়ে জীমূতবাহনকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। মলয়কেতু শুভদিনে কন্যা মলয়বতীর সঙ্গে জীমূতবাহনের বিয়ে দিলেন।

এর কিছুদিন পর একদিন মিত্রাবসুর সঙ্গে মলয়পর্বতের উত্তর দিকে বেড়াতে বেড়াতে জীমূতবাহন একটা প্রকাণ্ড সাদা ঢিবি দেখে কৌতূহলী হয়ে বললেন, ওটা কি?

মিত্রাবসু বললেন, একসময় গরুড়ের সঙ্গে নাগদের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল এবং নাগরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করলে গরুড় বললেন, যদি তোমরা আমার আহারের জন্য প্রতিদিন একটা করে নাগ উপহার দিতে পার তবে তোমাদের অন্য কাউকে আমি খাব না।

উপায় না দেখে নাগরা গরুড়ের এই প্রস্তাবে সম্মত হলো এবং সেইদিন থেকে প্রতিদিন একটি নাগ সেখানে উপস্থিত থাকে। গরুড় যথাসময়ে এসে ঐ নাগকে আহার করে চলে যায়। দীর্ঘদিন ধরে নাগদের হাড় জমে জমে ঐ সাদা পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে।

জীমূতবাহন এই কথা শুনে মনে বড় ব্যথা পেলেন। তখন তিনি ভাবলেন, এখন প্রায় দুপুর, নিশ্চয়ই কোন এক নাগ গরুড়ের আহারের জন্য সেখানে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমি আমার নিজের প্রাণ দিয়ে ঐ নাগকে রক্ষা করব। এই সঙ্কল্প করে কৌশলে শ্যালককে বিদায় দিয়ে সেইদিকে রওনা হলেন। কিছুদূর গিয়েই কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন এবং তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এক বৃদ্ধা নাগী কপাল চাপড়ে কাঁদছে।

জীমূতবাহন তাঁকে বললেন, মা, তুমি কাঁদছ কেন ?

সে তখন সকল কথা বলে বললো, আজ আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের পালা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গরুড় এসে তাকে আহার করবে। শঙ্খচূড় আমার একমাত্র পুত্র, আমার আর কোন সন্তান নেই।

জীমূতবাহন বললেন, মা, তুমি আর কেঁদ না, আমি আমার প্রাণ দিয়ে তোমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করব।

নাগী বললো, বৎস ! তুমি কেন পরের জন্য প্রাণ দেবে। তাছাড়া নিজের পুত্রের প্রাণ বাঁচাতে পরের পুত্রের প্রাণদান অত্যন্ত পাপ কাজ, তোমার এই প্রস্তাব সমর্থন করা যায় না।

দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে এমন সময় শঙ্খচূড় সেখানে এসে উপস্থিত হল। জীমূতবাহনের পরিচয় জেনে সে বললো, মহারাজ ! আপনি অন্যায় প্রস্তাব করছেন, ভেবে দেখুন, প্রতিদিন কত প্রাণী জন্মাচ্ছে ও মরছে। আপনার মত ধর্মপ্রাণ ও দয়ালু সংসারে সচরাচর দেখা যায় না। আমার মত সামান্য প্রাণীকে বাঁচাতে আপনার মত মহৎ প্রাণ বিনষ্ট হওয়া ঠিক নয়। আপনি বেঁচে থাকলে অনেক প্রাণীর উপকার হবে।

জীমূতবাহন বললেন, শোন শঙ্খচূড়, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, নিজের জীবন দিয়ে তোমার প্রাণ বাঁচাব। আমি ক্ষত্রিয় হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না। তুমি এখান থেকে চলে যাও। এই বলে শঙ্খচূড়কে বিদায় দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গরুড়ের আসার অপেক্ষায় বসে রইলেন।

জীমূতবাহনকে নিরস্ত করতে না পেরে শঙ্খচূড় দেবী কাত্যায়নীর সামনে উপস্থিত হয়ে একমনে জীমূতবাহনের জীবন রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

যথাসময়ে গরুড় এসে জীমূতবাহনকে ঠোঁটে তুলে আকাশে উঠে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। কিছুক্ষণ পর জীমূতবাহনের ডান হাতের নাম লেখা মণিময় কেয়ুর রক্তে মাখামাখি হয়ে মলয়বতীর সামনে এসে

পড়ল ! তিনি সেটি দেখেই চিনতে পেরে কেঁদে উঠলেন। রাজবাড়ির সকলেই এই দৃশ্য দেখে হাহাকার করে উঠলো।

রাজা মলয়কেতু চারদিকে লোক পাঠিয়ে পুত্রসহ নিজেও জীমূতবাহনকে খুঁজতে বেরলেন।

শঙ্খচূড় জীমূতবাহনের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনে দ্রুত সেখানে উপস্থিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, হে বিদঙ্গরাজ, তুমি যাঁকে খাবে বলে নিয়ে গিয়েছ, তিনি ধর্মপ্রাণ জীমূতবাহন, আমি শঙ্খচূড় বলছি, তিনি তোমার নির্দিষ্ট আহার নয়—তোমার আহার আমি। তুমি তাঁকে ত্যাগ করে আমাকে আহার করে তোমার ক্ষুধা মেটাও। যদি তুমি তাঁকে খাও তবে অধর্মের কাজ করবে।

এই কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গরুড় দেখলেন, তাই তো ! এতো কোন নাগ নয়, এ আমি কাকে খাচ্ছি।

জীমূতবাহন তখন মৃতপ্রায়। গরুর তাঁর মুখ থেকে সব কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, সকলেই নিজের জীবন বাঁচাতে চায় আর তুমি পরের জীবন বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করলে ?

জীমূতবাহন বললেন, আজ বা দুদিন পরে মৃত্যু তো সকলকেই গ্রাস করবে, তবে দুদিন আগে মরে যদি কারো উপকার করা যায় তবেই তো জীবন সার্থক। এই জন্যই আমি নিজের জীবন দিয়ে শঙ্খচূড়কে বাঁচাতে চাই।

এই কথা শুনে গরুড় সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার মত আর একজন ধর্মপ্রাণ এই পৃথিবীতে আছেন কিনা সন্দেহ, তুমি বর প্রার্থনা কর।

জীমূতবাহন বললেন, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে প্রতিজ্ঞা করুন আজ থেকে আর কোন নাগকে খাবেন না আর যেসব নাগদের ইতিপূর্বে খেয়েছেন এই মুহূর্তে তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দিন।

গরুড় সম্মত হয়ে পাতালে গিয়ে অমৃত এনে সেই অমৃত জড়ো

করা হাড়ের উপর ছিটিয়ে দিতেই সমস্ত নাগরা বেঁচে উঠলো।

গরুড় জীমূতবাহনকে বললেন, রাজকুমার! আমার কৃপায় তুমি পুনরায় তোমার রাজ্য ফিরে পাবে।

এই সুখবর শুনে মলয়রাজের প্রাসাদেও আনন্দের সীমা রইল না। এই খবর শুনে প্রজারাও এসে রাজা জীমূতকেতুর কাছে ক্ষমা চাইল এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

বেতাল জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ, জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড়, এই দুজনের মধ্যে কে বেশী মহৎ।

রাজা বললেন শঙ্খচূড়।

বেতাল বলল কেন?

রাজা বললেন জীমূতবাহন ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়েরা প্রাণের মায়া রাখেনা। সুতরাং শঙ্খচূড়ের জন্য প্রাণ বিসর্জন জীমূতবাহনের পক্ষে শক্ত নয়। কিন্তু শঙ্খচূড় প্রথমে জীমূতবাহনের প্রাণ দেওয়া বিষয়ে কোন প্রকারে সম্মত হয় না। পরে নিরূপায় হয়ে সম্মত হলেও দেব মন্দিরে গিয়ে উপকারীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাতে লাগল। কেবল তাই নয় পুনরায় ফিরে এসে প্রাণ দানে বদ্ধপরিকর হয়ে জীমূতবাহনকে বাঁচাল। তা'হলে দেখ শঙ্খচূড়ের মহত্ব কত বড়!

এই উত্তর শুনে বেতাল আর কোন কথা না বলে রাজার কাঁধ থেকে নেমে গাছে গিয়ে উঠল আর রাজাও তাকে পুনরায় কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন আর বেতালও তার ষোড়শ গল্প বলতে আরম্ভ করল।



ষোড়শ উপাখ্যান

বেতাল বলল—মহারাজ চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে এক বনিক ছিল। উন্মাদিনী নামে তার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তার বিয়ের সময় হলে একদিন রত্নদত্ত সেই দেশের রাজার কাছে গিয়ে বলল—মহারাজ, আমার এক সুরূপা কন্যা আছে যদি আপনি ইচ্ছে করেন তাকে বিয়ে করতে পারেন। নতুবা আমাকে অন্য পাত্রের সন্ধান করতে হবে।

মেয়েটিকে দেখতে রাজা কয়েকজন মন্ত্রীকে পাঠালেন।

মেয়েটির রূপ দেখে মন্ত্রীরা মুগ্ধ হলেন কিন্তু সকলে মিলে যুক্তি করলেন, এই মেয়ের সঙ্গে যদি রাজার বিয়ে হয় তবে রাজা রাজকার্য ত্যাগ করে রাণীকে নিয়ে অন্তঃপুরেই সময় কাটাবেন। রাজ্যের প্রজাদের এতে অমঙ্গল হবে। মন্ত্রীরা রাজাকে জানালেন এই মেয়ে মোটেই মহারাণী হবার মত সুন্দরী নয়।

রাজা এই বিয়েতে অসম্মত হলে রত্নদত্ত সেনাপতি বলভদ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর উন্মাদিনী তার স্বামীর সঙ্গে সুখেই বাস করতে লাগল, কিন্তু তার মনে একটা জ্বালা রয়ে গেল যে রাজা তথাকথিত অশুভ লক্ষণের জন্য তাকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে অপমান করেছেন।

ক্রমে শীতকাল কেটে গিয়ে মধুর বসন্তকাল এলো। একদিন রাজা হাতীতে চড়ে নগরে বসন্তোৎসব দেখতে বেরুলেন, আর তাঁর রূপ দেখে পাছে যুবতী নারীরা নিজেদের মানসিক সতীত্ব হারায় এইজন্য তাদের সতর্ক করে দিতে একদল লোক দামামা বাজাতে বাজাতে তাঁর আগে আগে চললো।

এই দামামার শব্দ শুনে উন্মাদিনী নিজের বাড়ির ছাদে উঠলো, রাজা তাকে প্রত্যাখ্যান করে যে অপমান করেছেন নিজের রূপ দেখিয়ে তার প্রতিশোধ নেবে সে। হাতীটি উন্মাদিনীর বাড়ির সামনে এলেই রাজার নজর পড়ল উন্মাদিনীর দিকে, কি দেখলেন তিনি ? দেখলেন প্রেমাগ্নির একটি উজ্জ্বল শিখা মলয়পর্বত থেকে আসা বসন্তানিলে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন রাজা সেই জমকালো রূপের দিকে ফলে বিজয়ী মদনের শরাঘাতে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁর ভৃত্যেরা অবশ্য শুশ্রূষা করে তখনই তাঁকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেল ; তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন তিনি শুনলেন যাকে দেখে তাঁর আজ এমন অবস্থা হ'ল সে আর কেউ নয়, সে সেই বণিক-কন্যা ব্রাহ্মণদের মুখে অশুভলক্ষণের কথা শুনে যাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যেসব ব্রাহ্মণ তাঁকে মেয়েটির অশুভলক্ষণের কথা বলেছিলেন তাদের তিনি তখনই তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে দিলেন। তারপর তিনি কি দিন কি রাত সবসময়ই ঐ সুন্দরীর রূপ ধ্যান করতে করতে নিজের মনে মনে বলতে লাগলেন,—ঐ সুন্দরীর মুখের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য যখন জগতের অগাধ আনন্দের উৎস তখন চাঁদ নিতান্ত মূর্খ আর নির্লজ্জ না হ'লে কখনও এমন করে আকাশে উদিত হয় ? সুন্দরীর কথা এমনি করে ভাবতে ভাবতে প্রেমানলে তুষের মত দগ্ধ হয়ে রাজা দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর এ দাহের কারণ তিনি লজ্জায় কারো কাছে প্রকাশ করতে পারতেন না। তাঁর নিতান্ত বিশ্বস্ত এবং অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁরা অবশ্য তাঁর বাইরের লক্ষণগুলি দেখে

কিছুটা আন্দাজ করে কৌশলে নানা প্রশ্ন করে আসল ব্যাপারটা জেনে নিলেন। তখন তাঁরা রাজাকে বললেন,ব্যাপার যখন এই,তখন আর এ নিয়ে আপনার ভাববার কি আছে, ও সুন্দরী ত আপনার হাতের মুঠোয়, ওকে আপনি নিয়ে নেন না কেন ? ধর্মপ্রাণ রাজা কিন্তু তাঁদের এ পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না।

ব্যাপারটা সেনাপতি বলভদ্রের কানে গেলে প্রকৃত রাজভক্ত তিনি তখন ছুটে এসে রাজার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, মহারাজ, ঐ দাসীকে আপনি অপরের স্ত্রী বলে মনে না করে নিজেরই দাসী বলে মনে করুন, আমি অকুণ্ঠচিত্তে ওকে দান করছি আপনাকে, আমার ভার্যাকে আপনি গ্রহণ করুন। আর এতে যদি আপনার আপত্তি থাকে আমি তাকে দেবালয়ে নিয়ে গিয়ে ত্যাগ করে আসছি, তখন তাকে গ্রহণ করলে আপনার কোন পাপ হবে না। সেনাপতি রাজাকে এইরকম সব কথা বলে নানা অনুনয় বিনয় করলেও রাজা তাতে স্বীকৃত না হয়ে বিরক্তির সুরে বললেন. রাজা হয়ে এমন অন্যায় কাজ করি কি করে, আমি যদি অধর্মের পথে চলি কে আর তখন ন্যায় পথে চলতে চাইবে ? আর তোমাকেও বলি, তুমি যখন আমায় ভক্তি কর, শ্রদ্ধা কর, তখন তুমিই বা আমায় দিয়ে এমন কাজ করাতে চাইছ কেন. আমার ক্ষণিক সুখের কারণ হলেও পরলোকে হবে অশেষ দুঃখের কারণ। আর তুমি যদি তোমার ধর্মপত্নী ত্যাগ করো তাহলে তোমাকে আমি শাস্তি না দিয়েও পারব না, এইরকম সব কথা বলে রাজা তাঁর সেনাপতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর নগরবাসীরা এবং রাজ্যের প্রজারাও এসে রাজাকে ঐ একই ধরনের অনুরোধ জানিয়েছিল, রাজা দৃঢ়চিত্তে সেসব অনুরোধে কান দিলেন না।

রাজা এরপর প্রেমজ্বরের আগুনে দগ্ধ হতে হতে একেবারে শেষ হয়ে গেলেন। অবশিষ্ট রইল কেবল তাঁর সুনাম। আর এইভাবে রাজার দেহাবসান সহ্য করতে না পেরে তাঁর সেবক সেনাপতি বলভদ্র অগ্নিপ্রবেশে নিজের দেহ বিসর্জন দিলেন। ভক্ত সেবকদের চরিত্র

চিরদিনই রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়।

বেতাল রাজার কাঁধে থেকে তাঁকে এই অপূর্ব কাহিনী শুনাবার পর বললো, এখন বলো ত রাজা, রাজা এবং তাঁর সেনাপতি এই দুইজনের মধ্যে কার মহত্ত্ব অধিকতর প্রশংসনীয়।

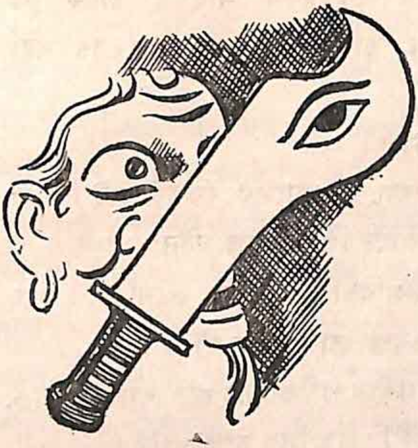
রাজা বেতালের কথার উত্তর দিতে তাঁর মৌনভঙ্গ করে বললেন, দুই রাজার মহত্ত্বই অধিকতর প্রশংসনীয়।

বেতাল বললো, তা কেন হবে, বেশী প্রশংসা প্রাপ্য সেনাপতিরই, কারণ তিনি বহুকাল এই সুন্দরী নারীর সঙ্গ-ম-ধুর্যের স্বাদ পাওয়া সত্বেও রাজার প্রতি ভক্তিবশতঃ স্ত্রীরত্ন তাকে দান করতে আগ্রহী হয়েছেন, আর রাজা ত এই নারী কেমন তা জানবার কোন সুযোগই পান নি।

বেতালের এই কথা শুনে রাজা হেসে উঠে বললেন, সেনাপতি তাঁর প্রভু রাজার জন্য যা করেছেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে? ভৃত্যেরা নিজেদের জীবন দিয়েও প্রভুর প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য, কিন্তু রাজার ঔদ্ধত্যে মদোন্মত্ত হস্তীর ন্যায় অন্যায়ের শিকল ছিঁড়ে নিজেদের ভোগ তৃষ্ণা মিটিয়ে থাকেন। দন্তাতিশয্যে অভিষেকবারি ছিটানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিবেকবুদ্ধি প্লাবিত হয়ে যায়, আর পাখার বাতাসে যেমন মশা মাছি পালায় তেমনি বৃদ্ধদের কাছ থেকে লব্ধ শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁদের কাছ থেকে দূরে পালায়। তাঁদের রাজছত্র তাঁদের যে কেবল সূর্যকিরণকেই কাছে আসতে দেয় না, শুধু তাই নয়, সত্যের কিরণকেও দেয় না। সমৃদ্ধিবাত্যায় নয়ন পীড়িত থাকায় ধর্মপথ ন্যায়পথ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই ন হুষের মত বিশ্ববিজয়ী রাজারাও মায়ের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে নানা দুর্ভোগ ভোগ করেছেন। কিন্তু এই রাজা পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও চঞ্চলা লক্ষ্মী-সদৃশা উন্মাদিনীর মোহে পড়েন নি। অধর্মের পথে পা না বাড়িয়ে তিনি বরং প্রাণ ত্যাগ শ্রেয় বলে মনে করেছেন। তাই আমার মতে রাজার মহত্ত্বই বেশী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

রাজার মুখে এই কথা শুনে বেতাল তাঁর কাঁধ ছেড়ে আবার সেই গাছে চলে গেল, আর রাজাও আবার সেখানে তাকে আনতে চললেন।

পুনরায় কাঁধে নিয়ে যখন রাজা চলতে আরম্ভ করলেন তখন বেতাল তার সপ্তদশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।



সপ্তদশ উপাখ্যান

বেতাল বললে মহারাজ! হেমকূট নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের গুণাকর নামে এক পুত্র ছিল। পুত্র বড় হয়ে জুয়াখেলে পিতার যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিল। তারপর আরম্ভ হল চুরি। তখন বিষ্ণুশর্মা পুত্রকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন গুণাকর অনেক দেশ ঘুরে এক শ্মশানে উপস্থিত হয়ে দেখল এক সন্ন্যাসী যোগাভ্যাস করছেন। সে যোগীকে প্রণাম করে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যোগী তাকে দেখেই বুঝলেন এই যুবক ক্ষুধায় কাতর। তাই তাঁর সংগৃহীত অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ এক নরকপাল তার সামনে দিয়ে তাকে খেতে বললেন।

গুণাকর বললো, প্রভু, এ খাদ্য গ্রহণ করতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

তখন সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে চোখ বুজতেই এক যক্ষকন্যা সেখানে উপস্থিত হয়ে বললো, আদেশ করুন প্রভু।

সন্ন্যাসী বললেন, এক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমার আশ্রমে এসেছে, তার উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা কর।

সন্ন্যাসীর আদেশ পাওয়া মাত্র যক্ষকন্যার মায়াবলে নিমেষের মধ্যে এক প্রাসাদ দেখা দিল। সে ব্রাহ্মণকে সেই প্রাসাদের মধ্যে

নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে উপাদেয় অনেকরকম আহারে তাকে তুষ্ট করে সুদৃশ্য মণিময় এক পালঙ্কে তাকে শুতে দিয়ে তার চরণ সেবা করতে লাগল।

গুণাকর পরম সুখে রাত কাটাল।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখল গতকালের কিছুই নেই। সে তখন অবাক হয়ে সেই সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললো।

সন্ন্যাসী বললেন, যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার প্রভাবে এসেছিল। যে লোকের যোগবিদ্যা জানা নেই যক্ষকন্যা তার কাছে থাকে না।

এই কথা শুনে গুণাকর সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে বললো, প্রভু, আমাকে বলুন কিভাবে আমি সেই বিদ্যায় সিদ্ধ হতে পারি।

সন্ন্যাসী তার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন, চল্লিশ দিন মাঝরাতে গলা অবধি ঠাণ্ডা জলে ডুবে থেকে একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্রটি জপ করবে।

গুণাকর সন্ন্যাসীর নির্দেশমত জপ করে তাঁর কাছে এসে বললো, প্রভু, আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। এবার আদেশ করুন আর কি করতে হবে?

সন্ন্যাসী বললেন, আরো চল্লিশ দিন জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে ঐ মন্ত্র জপ করলেই তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

গুণাকর বললো, প্রভু, অনেকদিন হলো গৃহত্যাগ করে এসেছি, বাবা-মাকে দেখতে বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে। আগে বাবা-মাকে দেখে আসি, তারপর আপনার নির্দেশমত কাজ করব।

সন্ন্যাসীর অনুমতি নিয়ে গুণাকর বাড়ি গেল। অনেকদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে বাবা-মার আনন্দের সীমা নেই। মা আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন এতদিন সে কোথায় ছিল?

তখন গুণাকর সমস্ত কথা খুলে বললো, এক সন্ন্যাসীর কাছে আমি এখন মন্ত্রসাধন করছি। তোমাদের দেখতেই এসেছিলাম, এবার

আবার ফিরে যাব।

শুনে মা বললেন, আমাদের এইভাবে দুঃখ দিয়ে তুই চলে যাস না, যোগাভ্যাস করবার বয়স এটা নয়। ঘরে থেকে সংসার করলেই যোগাভ্যাসের ফল পাবি। আমরা বৃদ্ধ হয়েছি, এখন আমাদের সেবা করাই তোর পরম ধর্ম।

গুণাকর শুনে একটু হেসে বললো, মায়াময় এই সংসার একেবারেই অসার। মায়াপ্রপঞ্চময় এ জগতে কেউ কারো নয়, সবই ভুল। এই মায়ায় আবদ্ধ থেকে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না। যে পথকে বেছে নিয়েছি, তাকে ছাড়তে পারব না। মায়ের শত কান্নাও তাকে আটকাতে পারল না। এই কথা বলে বাবা-মাকে প্রণাম করে সে বাড়ি থেকে চলে গেল।

সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে জপ করেও কিন্তু কোন ফল হল না।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে বললো, মহারাজ, কেন ব্রাহ্মণ যুবক সবকিছু করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারল না?

বিক্রমাদিত্য বললেন, যোগসাধনে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণকুমারের সেটা ছিল না বলেই সে অকৃতকার্য হয়েছিল। এই শুনে বেতাল বলল, যে সিদ্ধিলাভ করতে এত কষ্ট সহ্য করলে তার নিষ্ঠা নেই, একথা কি রকম হল? রাজা বললেন তার যদি সাধনায় একাগ্রতাই থাকতো তাহলে সেকি তা ছেড়ে বাপ-মাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়। আর যোগ শেষ না করে যাবেই বা কেন? এখানেই বোঝ তার একান্ত নিষ্ঠার অভাব, তাই সে সিদ্ধিলাভ করতে পারল না।

এই কথা শুনে বেতাল মনে মনে রাজার বুদ্ধির প্রশংসা করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠলো।

রাজা বিক্রমাদিত্যও তাকে কাঁধে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করল। আর বেতালও তার অষ্টাদশ গল্প আরম্ভ করলেন।



অষ্টাদশ উপাখ্যান

বেতাল বলল—মহারাজ !

কুবলয়পুরে ধনপতি নামে এক ধনবান বণিক বাস করতেন ! ঐ বণিকের কন্যার নামও ধনবতী। গৌরীদত্ত নামে এক বণিকের সাথে ধনবতীর বিয়ে হয়েছিল। যথাসময়ে ধনবতীর এক কন্যা হল, কন্যার নাম মোহিনী।

মোহিনীর পিতার মৃত্যু হল। তারপর দুষ্ট আত্মীয় স্বজন ধনবতীর যাবতীয় অর্থ চুরি করে নিল।

প্রাণের ভয়ে অন্ধকার অমাবস্যার রাতে একাকিনী মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি রওনা হল ধনবতী।

অন্ধকার রাতে পথ ভুলে ধনবতী এক শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে এক চোর রাজার দণ্ডাদেশে তিনদিন শূলে বসে ছিল। ভগবান রক্ষাকর্তা তাই তিনদিনেও তার প্রাণ যায়নি।

অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে ধনবতীর সঙ্গে ধাক্কা লাগল। চোর কাতর স্বরে বললো, আমার এই কষ্টের উপর আবার কষ্ট দিলে, কে তুমি ?

এই কথা শুনে ধনবতী বললে, জেনেশুনে তোমাকে এ কষ্ট দিই নি, অন্ধকারে তোমাকে দেখতে পাই নি। আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু তুমি এই অন্ধকার রাত্রে এখানে কেন কষ্ট ভোগ করছ ?

চোর বললো, আমি জাতিতে বণিক। চুরির অপরাধে রাজা আমাকে শূলদণ্ড দিয়েছেন। জন্মকালে এক জ্যোতিষ আমার হাত দেখে বলেছিলেন অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু নেই, তাই আজ তিনদিন চলে গেলে তবু আমার মৃত্যু হচ্ছে না। কিন্তু এ যন্ত্রণা সহ্য করাও যাচ্ছে না। একমাত্র তুমি আমাকে এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই নিতে পার। তুমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে আমি যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচি। আমার অনেক ধনসম্পত্তি আছে, আমি সেসব তোমায় দেব।

ধনসম্পত্তির কথা শুনে ধনবতীর আগ্রহ হল। সে বললো, কিন্তু তুমি তো এখনই মারা যাবে। আমার যে নাতির মুখ দেখবার বড়ই ইচ্ছা আছে, তাতো আর সম্ভব হবে না।

চোর ধনবতীর কথা শুনে বললো, তুমি কন্যাদান করে আমাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও, আমি অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি তোমার কন্যা বড় হলে কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবে তাহলেই নাতির মুখ দেখতে পাবে।

চোরের কাতর আবেদনে ধনবতী তার মেয়ের সঙ্গে চোরের বিয়ে দিল।

চোর বললো, সামনে ঐ যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে, ওখানে আমার বাড়ি। বাড়ির পূর্বদিকে একটা কুয়োর কাছে এক বটগাছের নীচে আমার সমস্ত ধনরত্ন মাটির নীচে আছে, তুমি সেগুলো নেবার ব্যবস্থা কর।

এই কথা বলার পবই চোরের মৃত্যু হল।

ধনবতী তখন চোরের কথামত সেই বটগাছের কাছে গিয়ে মাটি খুঁড়ে সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। সব ঘটনা বাবাকে বলে সেইসব ধনরত্ন তাঁকে দিয়ে সেখানেই দিন কাটাতে লাগল।

তারপর ধনবতীর মেয়ে মোহিনীর বিয়ের বয়স হয়েছে। একদিন সখীদের সঙ্গে জানালা দিয়ে রাস্তায় চলমান রথের দিকে তাকিয়েছিল

মোহিনী।

সেই সময় সুপুরুষ এক ব্রাহ্মণপুত্রকে সেখানে দেখতে পেয়ে মোহিনী তার রূপে মুগ্ধ হল।

মোহিনী সখীকে বলে সেই ব্রাহ্মণপুত্রকে তার মা ধনবতীর কাছে উপস্থিত করল এবং ব্রাহ্মণপুত্রকে সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করার কিছুদিন পর মোহিনী একটি পুত্র লাভ করল। মোহিনী স্বপ্ন দেখল ঃ বাঘ-ছাল পরা তিনটি চোখ, কপালে বাঁকা চাঁদ। রূপোর মত গায়ের রং, ষাঁড়ের পিঠে বসা এক সুপুরুষ তাকে বলছেন ঃ তোমার পুত্র ক্ষণজন্ম। আগামীকাল মাঝরাতে তোমার ছেলেকে একহাজার মোহরের সঙ্গে সুন্দর একটি প্যাটরার মধ্যে ভরে রাজ-প্রাসাদের সদর দরজার সামনে রেখে আসবে। অপুত্রক রাজা তাকে পুত্রের মত লালনপালন করে বড় করে তুলবে এবং ভবিষ্যতে সেই হবে রাজা।

মোহিনীর ঘুম ভেঙে গেলে সে এই স্বপ্নের কথাই ভাবতে লাগল। তারপর মাকে সব কথা খুলে বললো।

স্বপ্নাদেশ মত ছেলেকেপ্যাটরায় ভরে মোহরসহ রাজার প্রাসাদের সদর দরজায় রেখে গেল তারা।

এদিকে রাজাও স্বপ্ন দেখলেন সেইরকম এক দিব্য পুরুষ তাঁকে বলছেন ঃ মহারাজ! আর ঘুমিয়ে থেক না, সুলক্ষণযুক্ত এক শিশু তোমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। দেরী না করে তাঁকে গ্রহণ কর এবং নিজ পুত্রের মত প্রতিপালন কর। ভবিষ্যতে সেই রাজা হবে এবং তোমার মুখ উজ্জ্বল করবে।

রাজার ঘুম ভেঙে গেল এবং তিনি সবকথা রাণীকে বললেন।

তখন দুজনে কৌতূহলী হয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে দেখলেন রাজা যা স্বপ্নে দেখেছেন সেইমত একটা প্যাটরা পড়ে আছে। প্যাটরার মুখ খুলে দেখলেন দিব্যকান্তি এক শিশু তার মধ্যে শুয়ে আছে এবং তার গায়ের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে আছে।

রাণী খুশি হয়ে সেই শিশুকে কোলে তুলে নিলেন এবং রাজা মোহরগুলো নিয়ে প্রাসাদে ঢুকলেন।

পণ্ডিতদের ডেকে ছেলের লক্ষণ পরীক্ষা করালেন।

পণ্ডিতরা সকলে একমত হয়ে বললেন, মহারাজ! এ ছেলে আপনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে। এই শিশু যে একদিন পৃথিবীর অধিশ্বর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাজা শুনে খুশি হয়ে পণ্ডিতদের যথেষ্ট উপহার দিলেন এবং গরীব দুঃখীদের পেট ভরে খাইয়ে নানা প্রকার উপহার দিলেন।

ছেলের বয়স ছয় মাস হলে মুখেভাত দিয়ে তার নাম রাখলেন হরিদত্ত।

তার বিদ্যাবুদ্ধি দেখে পণ্ডিতরা হরিদত্তর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

যথাকালে হরিদত্ত সর্ববিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠল।

রাজা একদিন স্বর্গে গেলে হরিদত্ত রাজা হলেন এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীর উপর তাঁর একাধিপত্য স্থাপন করলেন।

কিছুদিন পর হরিদত্ত তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে অনেক তীর্থ ঘুরে শেষে গয়ায় এসে ফল্গু নদীর তীরে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করে পিণ্ডদানে বসলেন।

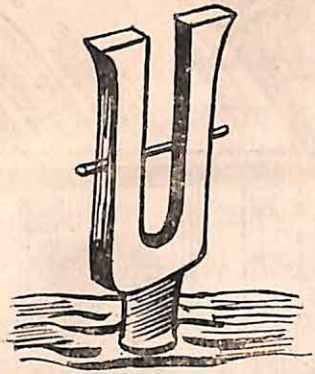
হরিদত্ত যখন পিণ্ডদান করতে গেলেন তখন জল থেকে তিনখানা ডানহাত উঠে এল। একটি সেই চোরের, একটি সেই বণিক বরের আর অন্যটি রাজার।

গল্প শেষ হলে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ বল দেখি—এদের মধ্যে কে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে হরদত্তের পিণ্ডের অধিকারী হবে? রাজা বললেন—"চোর"। বেতাল বলল—আর দু'জন কিসে অপরাধী? রাজা বললেন চোর ধনবতীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিল যে মোহিনীর দ্বিতীয় বিয়ের পর যে পুত্র জন্ম নেবে সে পুত্র তার হবে। তারপর নিরুদ্দিষ্ট বণিক অর্থলোভে মোহিনীকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের কিছুকাল পরে সে টাকাকরি নিয়ে পালিয়েছে; স্ত্রী-পুত্রের উপর যা কর্তব্য তা সে পালন করেনি। সে পিতা হলেও

এই পুত্রের পিণ্ড নেবার অধিকার নেই। আর রাজা সহস্র স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে তাকে প্রতিপালন করেছেন মাত্র। সে জন্যও তিনি পিণ্ড গ্রহণের অধিকারী হতে পারেন না। আমার মতে একমাত্র চোরই পিণ্ডান্নের অধিকারী।

বেতাল ঠিক উত্তর পেয়ে আবার সেই শিরীষ গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল আর রাজাও তাকে গাছ থেকে পেড়ে আবার রওনা হলেন।

বেতাল তখন তার উনবিংশ গল্প আরম্ভ করল।



ঊনবিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ !

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন।

তিনি একদিন একাকী ঘোড়ায় চড়ে শিকারের সন্ধান না পেয়ে এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি সুন্দর সরোবর ছিল। তার নিকটে একটা গাছে ঘোড়াটাকে বেঁধে বিশ্রাম করতে লাগলেন !

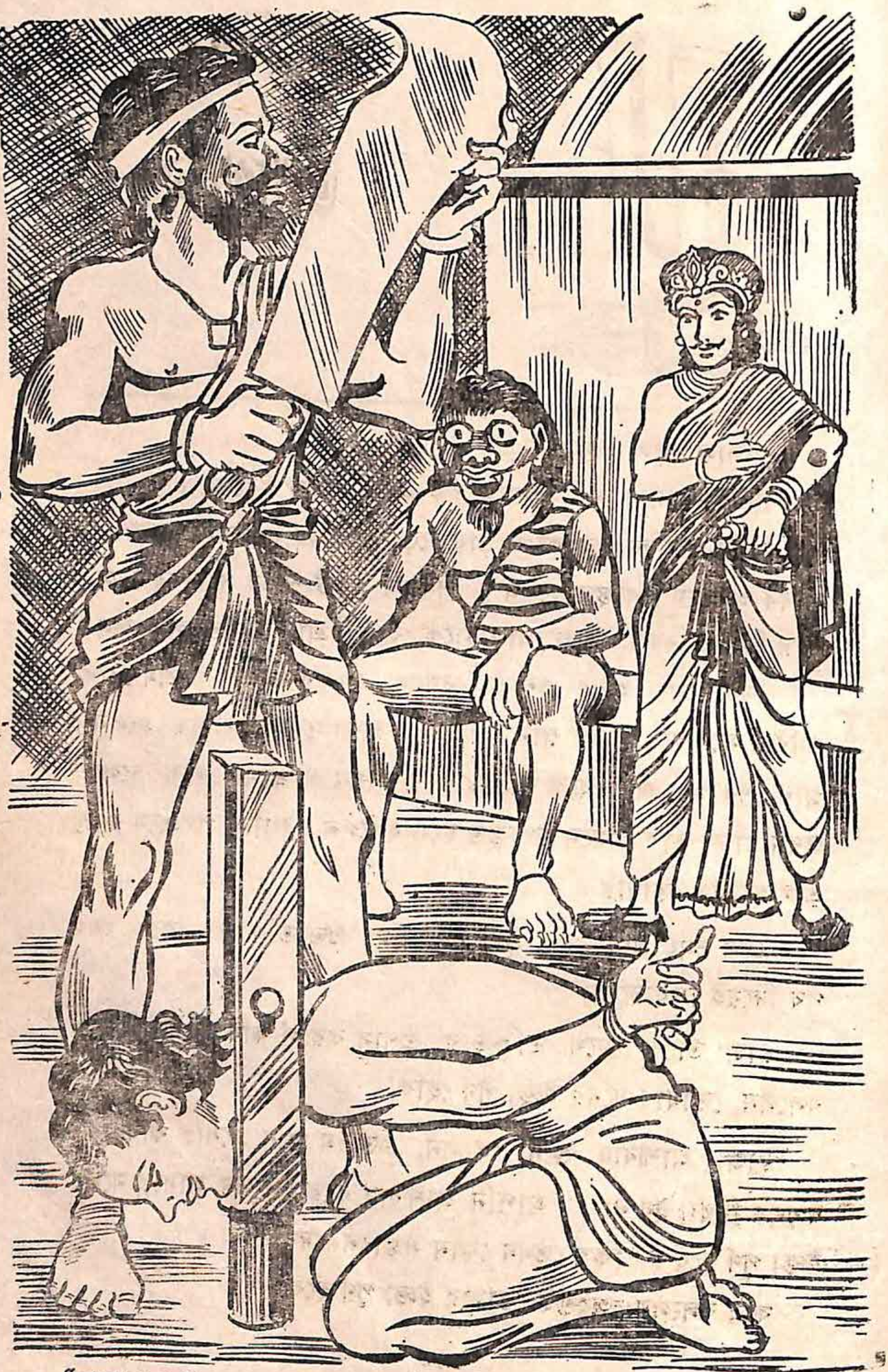
এমন সময় অপূর্ব সুন্দরী দেখতে এক ঋষিকন্যা আশ্রম থেকে বেরিয়ে সরোবরে নামল স্নান করতে। রাজা তার রূপে মুগ্ধ হলেন। স্নান শেষ করে জল থেকে উঠে ঋষিকন্যা যখন আশ্রমের দিকে চলেছে তখন রাজা তার সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি পথশ্রমে ক্লান্ত এক অতিথি তোমার।

এমন সময় ঋষিও ফল, ফুল, কুশ সমিধ প্রভৃতি সংগ্রহ করে সেই পথ দিয়েই ফিরছিলেন।

রাজা তাঁকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলে ঋষি আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

রাজা আশীর্বাদ শুনে বললেন, এতদিন শুনে এসেছি ঋষিবাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। আপনি আশীর্বাদ করে বললেন আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু তেমন কোন সম্ভাবনা দেখছি না।

ঋষি বললেন, অবশ্যই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।



"রাজা খড়্গ দিয়ে ব্রাহ্মণপুত্রের মাথাটি কেটে ফেললেন"·· পৃঃ ১১৮

রাজা হাতজোড় করে বললেন, আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল। আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন প্রভু।

ঋষি রাজার এই প্রস্তাবে মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন রাজার উপর কিন্তু সেভাব প্রকাশ না করে তাঁর কথার সম্মান রক্ষার জন্য রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

রাজা নববধূকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। পথে রাত হয়ে গেল। রাজা ও তাঁর স্ত্রী—ফলাহার করে গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে এক রাক্ষস এসে রাজাকে জাগিয়ে বললো, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি তোমার স্ত্রীর নরম মাংস খাব। রাজা বললেন, তুমি আমার স্ত্রীর মাংস না খেয়ে অন্য যা চাও তাই দেব।

রাক্ষস বললো, বেশ, যদি একটি বারো বছর বয়সের ব্রাহ্মণের ছেলের তোমার হাতে মাথা কেটে আমাকে দিতে পার তবে তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পারি।

রাজা তাঁর নববধূকে রক্ষা করার জন্য এই পাপ কাজে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, সাত দিন পর আমার রাজধানীতে এলে তুমি তোমার জিনিস পাবে।

পরদিন সকালে রাজা নববধূকে নিয়ে রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রীকে সমস্ত বিষয় বললেন।

মন্ত্রী সব শুনে বললেন, কিছু ভাববেন না মহারাজ, আমি ব্যবস্থা করছি।

রাজা মন্ত্রীর কথামত নিশ্চিন্ত রইলেন।

মন্ত্রী এক স্যাকরাকে দিয়ে একটা মানুষের সমান সোনার মূর্তি তৈরি করে তাকে মূল্যবান গয়না পরিয়ে রাজধানীর চারদিকে ঘুরিয়ে ঘোষক দিয়ে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, যে ব্রাহ্মণ তাঁর বারো বছরের ছেলেকে বলিদান দেবেন তিনি এই মূল্যবান মূর্তিটি পাবেন।

এক ব্রাহ্মণের বারো বছরের একটি ছেলে ছিল। তাঁরা বড়ই

গরীব। দুই বেলা খাবার জোটে না।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বললেন, দেখ, এই দারিদ্র্য আর সয় না! ছেলেকে বলি দিলে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হব আমরা। ছেলের জন্য ভাবনা কি, আবার হবে।

ব্রাহ্মণীও এ বিষয়ে একমত হলেন। পুত্রকে রাজার হাতে দিয়ে সেই মূল্যবান মূর্তি বিক্রি করে অনেক অর্থের মালিক হলেন।

রাজা ব্রাহ্মণপুত্রকে পেয়ে খুব খুশি। আর কোন ভয় নেই। নির্দিষ্ট দিনে রাক্ষসও এসে উপস্থিত।

মন্ত্রী ব্রাহ্মণপুত্র ও খড়্গ নিয়ে রাজার সামনে উপস্থিত করলেন।

ব্রাহ্মণপুত্রকে বলি দেবার পূর্বমূহূর্তে ব্রাহ্মণপুত্র একটু হাসল।

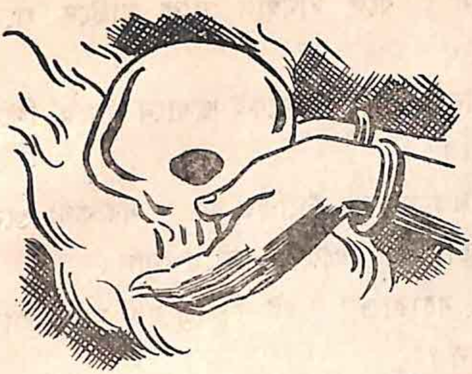
রাজা খড়্গ দিয়ে ব্রাহ্মণপুত্রের মাথাটি কেটে ফেললেন।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ, এইরকম বীভৎসভাবে মৃত্যুর সময় সকলেই ভয়ে কাঁদে কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্র না কেঁদে হেসেছিল কেন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, বাল্যকালে পিতামাতা প্রতিপালন ও দেখাশোনা করে থাকেন। তারপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে রাজা তাকে রক্ষা করেন! কিন্তু আমার অদৃষ্টে সবই বিপরীত হ'ল, পিতামাতা অর্থলোভে আমায় বিদায় করলেন, প্রাণভয়ে যে রাজার শরণাগত হব—তিনিও মস্তক ছেদনে বদ্ধপরিকর, মনে মনে এই কথা ভেবে বালক হেসেছিল।

বেতাল রাজার এই উত্তর শুনে আর বিলম্ব না করে সেই গাছে গিয়ে উঠলো আর রাজাও তাকে গাছ থেকে নামিয়ে এনে কাঁধে নিয়ে রওনা হলেন।

বেতালও তার বিংশ গল্প আরম্ভ করল।



বিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ! অর্থদত্ত নামে এক বণিক বিশালপুর নগরে বাস করতেন। অনঙ্গমঞ্জরী তার আদরিনী কন্যা, বিয়ের উপযুক্ত হলে মদনদাস বণিকের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন।

বিয়ের কিছুদিন পর মদনদাস তার স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরীকে তার বাবা-মার কাছে রেখে বাণিজ্য করতে বিদেশে রওনা হল।

একদিন অনঙ্গমঞ্জরী জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজন চলাচল দেখছিল। এমন সময় কমলাকর নামে এক সুন্দর সুপুরুষ ব্রাহ্মণপুত্রকে দেখে সে মুগ্ধ হলো। কমলাকরও তাকে দেখে মুগ্ধ হলো। চার চোখের মিলন হলো।

দুজনেই দুজনের জন্য মৃতপ্রায়। অনেক চিকিৎসা হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

দুজনেরই এক কথা—সেই তাকে চায়!

অনঙ্গমঞ্জরীর সখী ঠিক করলো, এ অবস্থায় কমলাকরকে এখানে আনতে না পারলে অনঙ্গমঞ্জীকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। তাই সে কমলাকরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বলে তাকে অনঙ্গমঞ্জরীর কাছে যেতে বললো।

কমলাকর সমস্ত শুনে তখনই অনঙ্গমঞ্জরীর সঙ্গে দেখা করতে ছুটলো। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, অনঙ্গমঞ্জরী প্রাণত্যাগ করেছে।

কমলাকরও 'হা প্রেয়সি'! বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটিতে পড়ে মারা গেল।

সকলে সকল বিষয় জানতে পেরে দুজনকেই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে একই চিতায় দাহ করা হল।

ঠিক সেই সময় মদনদাসও সেখানে উপস্থিত হল। সব কথা শুনে সেও মনের দুঃখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করল।

বেতাল বললো, বল মহারাজ! এই তিনজনের মধ্যে কার ভালবাসা সবচেয়ে বেশী ছিল?

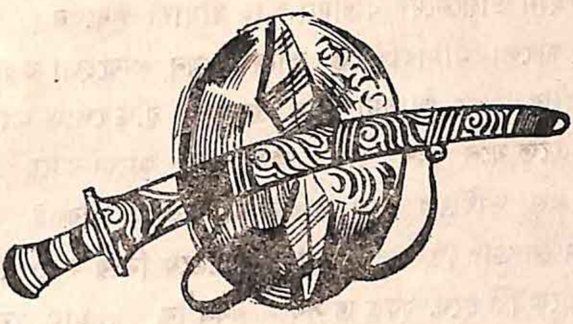
রাজা বললেন, মদনদাস।

বেতাল বললো, কেন?

রাজা বললেন, অনঙ্গমঞ্জরী আর সেই ব্রাহ্মণপুত্র দু'জনে দুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। সুতরাং তাদের এ মৃত্যু অসম্ভব নয়, কিন্তু মদনদাস তার স্ত্রী অন্যের প্রতি অনুরক্তা ছিল জেনেও তার শোকে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে প্রাণত্যাগ করল! এটা কি সামান্য ভালবাসা?

উত্তর শুনে বেতাল আবার গাছে গিয়ে ঝুলল আর রাজাও তাকে নামিয়ে রওনা দিলেন।

বেতালও একবিংশ গল্প আরম্ভ কবল।



একবিংশ উপাখ্যান

সেকালে জয়স্থল নগরে বিষ্ণুস্বামী নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর চার ছেলে কিন্তু চার অবতার। বাবার ঠিক উল্টো। বড়টি জুয়াড়ী, মেজটি চরিত্রহীন, সেজটি নির্লজ্জ - বেহায়া। ছোটটি নাস্তিক।

এই সময়ে বাবা-মা দুজনেই মারা গেলে চার ছেলের অবস্থা হল তখন অতীব শোচনীয়, কোন অভিভাবক না থাকায় বিষয় আশয় যা কিছু ছিল আত্মীয়স্বজনেরা সেসব আত্মসাৎ করলো, তখন তারা চার ভাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, কিছুই আর রইল না যখন আমাদের এখানে, তখন আর এখানে থেকে কি খেয়ে বাঁচব আমরা, এরচেয়ে চলো আমরা আমাদের মামাবাড়ি যজ্ঞস্থলে যাই, মতামহ যদিও স্বর্গে গেছেন, মামারা ত আছেন, সেখানে গেলে তাঁরা কি আমাদের ফেলে দেবেন ? না, তা কখনও দিতে পারেন না।

এইরকম সব যুক্তি করে চার ভাই যজ্ঞস্থলে গিয়ে হাজির হ'ল, মামারা তাদের সত্যিই ফেলে দিতে পারলেন না, আহার ও বাসস্থান —দুইই মিললো তাদের সেখানে। চার ভাই সেখানে থেকে বেদ-পাট ইত্যাদি করতে লাগল। কিন্তু সে আর কত দিন ? নিঃস্ব

কপর্দকহীন ভাগনেদের কতদিন আর মামারা পুষবেন ? চার ভাইই লক্ষ্য করলো মামাবাড়ীতে তাদের যেন অবহেলা করা হচ্ছে, ঘৃণা করা হচ্ছে। এ ভাবটা যেন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে লাগল ! চার ভাইই এতে মনে দুঃখ পায়, কেউ আর কারো কাছে সেকথা বলে না। বড় ভাইয়ের মনে দুঃখটা নাকি একটু প্রবলই হয়েছিল তাই একদিন সে তার তিন ভাইকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললো, আর চুপ করে থেকে কি হবে, বুঝছ ত সব ? এখন কি করা যায় বলো ? ভাগ্য, ভাগ্যই সব, কারোরই নিজের কোন কিছু করবার সাধ্য নেই। সাধ্য যে নেই তার প্রমাণস্বরূপ আমি যা বলতে যাচ্ছি তা শোন। মন খারাপ নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে আমি এক শ্মশানে গিয়ে পড়লাম। সেখানে গিয়ে দেখি একটা মৃত লোক মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, নড়ন চড়ন নেই, মুখের কথা ত নেইই, দুঃখ উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। দেখে হিংসে হ'ল আমার, ভাবলাম এ-ই ত সুখী, দুঃখ দুশ্চিন্তার ভার আর বহন করতে হচ্ছে না এর। ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম আমিও মরি,—তাতেই সমস্ত কষ্টের অবসান। মরবার জন্য একটা দড়ি যোগাড় করে ফাঁস তৈরি করে গাছে বেঁধে তার মাঝে গলা দিয়ে ঝুললাম, কিন্তু ভাগ্যে তখন মরণ নেই, তাই মরণ হ'ল না আমার, দড়ি ছিঁড়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। যখন আমার জ্ঞান হ'ল তখন দেখি একজন সহৃদয় লোক আমার মাথাটা তাঁর কোলে তুলে নিয়ে তাঁর উত্তরীয়ের প্রান্ত দিয়ে আমায় বাতাস দিচ্ছেন ; আমাকে চোখ মেলতে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, ভাই তুমি বুদ্ধিমান লোক হয়ে এ করতে গিয়েছিলে কেন ? জানই ত জগতের সুখ দুঃখ সবই ভাল আর মন্দ কর্মের ফল, কোন কিছুর জন্য দুঃখ পেয়ে থাক ত এবার থেকে ভাল কাজ করতে সুরু করে দাও, —বাস, হয়ে গেল, সুখ পাবে তুমি, আত্মহত্যা করতে যাওয়ার দরকার কি ? আত্মহত্যা করলে যে নরকে যেতে হয় তা ত শোনা আছে ? তবে ? লোকটি আমায় এইরকম সব সান্ত্বনার কথা বলেই চলে

গেলেন। আর আমিও আত্মহত্যার বাসনা ত্যাগ করে এখানে চলে এলাম। এবার বুঝে দেখ অদৃষ্টে লেখা না থাকলে আত্মহত্যাও করা যায় না। যা'ক ওসব কথা, এখন ঠিক করলাম কোন তীর্থস্থানে গিয়ে কঠোর তপস্যায় সেখানে দেহপাত করব, তা হ'লে পরজন্মে দারিদ্র্যের কষ্ট আর আমায় ভোগ করতে হবে না।

বড়র কথা শুনে ছোট তিন ভাই বললো, দাদা, অর্থহীন নিঃস্ব বলে আপনি এমন ভেঙে পড়েছেন কেন? ধনের কি কোন স্থিরতা আছে? শরৎকালের মেঘের মত ও জিনিস এই আছে ত—এই নেই। সম্পদ আর চঞ্চলা নারীকে চোখে চোখে রেখে পাহারা দিলেও কেউ চিরকাল রক্ষা করতে পারে না।

শুনে বড় ভাই বললো, তাহলে কি করা যায় বলো?

ছোটরা বললো, আমরা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে ঘুরে এমন দিব্য গুণ অর্জন করব, যার দ্বারা চঞ্চলা লক্ষ্মীকে চঞ্চল হরিণের মত ঘরে বেঁধে রাখা যায়।

বড় ভাই ছোটদের কথা মেনে নিলো। সবাই মিলে তখন ঠিক করলো পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে দিব্য বিদ্যা অর্জন করে একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই এসে মিলিত হবে। এরপর ঐ বিদ্যা-লাভের জন্য কেউ গেল পূবে, কেউ গেল পশ্চিমে, কেউ উত্তরে কেউ দক্ষিণে। সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বিদ্যা অর্জন করে একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে চার ভাইই আবার মিলিত হ'ল। এরপর কথা উঠলো—কে কি বিদ্যা অর্জন করে এসেছে। একজন বললেন, কোন মৃত জীবের হাড় পেলে আমি আমার বিদ্যাবলে তাতে মাংস বসিয়ে দিতে পারি, দ্বিতীয়জন বললো, আমি আবার তাতে চামড়া এবং লোম বসিয়ে দিতে পারি, তৃতীয় ভাই বললো, আমি তাতে ঐ জীবের অন্যান্য অঙ্গ সৃষ্টি করে—তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিতে পারি, তৃতীয়ের কথা শেষ হ'লে চতুর্থ ভাই বললো, আমি শিখে এসেছি—এইরকম মৃত জীবের দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে। প্রত্যেক

ভাই-ই নিজের নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে উৎসুক। সুরু হ'ল হাড় খোঁজা, খুঁজতে খুঁজতে পাওয়াও গেল বনের মাঝে কয়েকখানা হাড়, সিংহের হাড়। হাড়টা পেয়েই চার ভাই নিজের নিজের বিদ্যা জাহির করতে সুরু করে দিলো। প্রথম ভাই হাড়ে মাংস লাগিয়ে দিল, দ্বিতীয় বসালো তাতে চামড়া আর লোম, তৃতীয় ভাই ঐ জীবের আর যে যে অঙ্গ বাকী ছিল তাতে সংযোগ করে তাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিল, হয়ে উঠল তখন সেটা একটা সিংহের দেহ, চতুর্থ ভাই-ই বা তখন তার বিদ্যা জাহির করবে না কেন?—সে তখন তাতে প্রাণ সঞ্চার করতেই সেই জীবন্ত ভয়ংকর সিংহটা কেশর ফুলিয়ে তীক্ষ্ণ নখওয়ালা থাবার ঘা মেরে ও কামড়ে চার ভাইকেই শেষ করে বনের কোন ঝোপে চলে গেল।

আসলে ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন না হয়,—তাহ'লে বহু কষ্টার্জিত বিদ্যাও সুফল দান না করে ধ্বংসই ডেকে আনে।

গল্প শেষ করে বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যের কাঁধ থেকে তাঁকে বললো, এবার তুমি বলো ত, রাজা, চার ভাইয়ের সৃষ্ট সিংহ যে চার ভাইকেই শেষ করলো—এর জন্য নির্বোধ কে?

উত্তরে রাজা বললেন—"যে প্রাণ দান করল—সেই সকলের অপেক্ষা নির্বোধ।"

রাজার মুখে এই কথা শুনে বেতাল তাঁর কাঁধ ছেড়ে আগে যেখানে ছিল, সেখানে আবার চলে গেল, এবং রাজা আবার সেখান থেকে তাকে তুলে আনলেন।

বেতালও তার দ্বাবিংশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।



দ্বাবিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলল মহারাজ !

বিষ্ণুপুর নগরে নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি একদিন ভাবলেন, বয়সের ভারে আমি এখন দুর্বল এবং সকল ইন্দ্রিয়ই বিকল। কিন্তু এখনও ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল রয়েছে। আমার অন্যের দেহে প্রবেশ করবার মন্ত্র জানা আছে। তাহলে কেন আমি জরা জীর্ণ হয়ে দিন যাপন করব ! তার চেয়ে রুগ্ন ও দুর্বল শরীর ত্যাগ করে কোন সুস্থ যুবকের শরীরে প্রবেশ করলে আবার কিছু দিন সংসারে সুখ সম্ভোগ করতে পারব। কিন্তু আমার এই ইচ্ছা ফলবতী করার জন্য সংসার ত্যাগ করে বনে যেতে হবে।

নারায়ণ মনে মনে এই কথা ভেবে বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বনে চলে গেলেন। স্ত্রী-পুত্রদের বলে গেলেন জীবনের শেষ ক'টা দিন যোগাভ্যাস করে কাটাবেন তাই বনই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান।

বনে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে এক যুবকে পরিণত হয়ে নিজের ইচ্ছামত ভোগ করতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজ, ব্রাহ্মণ সেই নিজের জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করার আগে কেঁদেছিলেন এবং তারপর যখন অন্যের দেহ ধারণ করলেন তখন হাসলেন। ব্রাহ্মণ কেন প্রথমে কাঁদলেন এবং পরে হাসলেন ?

বিক্রমাদিত্য বললেন "শোন বেতাল ! পূর্ব শরীর ত্যাগের সময়

ব্রাহ্মণ ভাবলেন, অতি বড় আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রইল না। তাই সেই দুঃখে ব্রাহ্মণ কেঁদেছিলেন। তারপর অপরের সুস্থদেহে প্রবেশ করে বিষয়ভোগের উত্তম সুবিধা হল। এই জন্যে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ হেসে ছিলেন।

বেতাল ঠিক উত্তর পেয়ে আর বিলম্ব না করে সেই গাছে গিয়ে উঠলো আর রাজাও তাকে পুনরায় গাছ থেকে নামিয়ে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন আর বেতালও তার কথামত ত্রয়োবিংশ গল্প বলতে আরম্ভ করল।



ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র। একজন ভোজন বিলাসী অন্যটি শয্যা বিলাসী। যে পুত্র ভোজন বিলাসী সে যদি ভাত ও তরকারীর কোন দোষ থাকে অন্যে না বুঝতে পারলেও সে অনায়াসে তা বুঝতে পারত। দ্বিতীয়টি শয্যা-বিলাসী অর্থাৎ শয্যায় কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি থাকলে সে তাতে শয়ন করতে পারত না। এই এক-এক বিষয়ে তাদের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতার কথা দেশের রাজা শুনতে পেলেন। তিনি কৌতূহলী হয়ে তাদের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে দু'ভাইকে ডেকে পাঠালেন। দুই ভাই রাজবাড়ীতে এল।

তারা দুজন নিজের নিজের পরিচয় দিলে প্রথমে ভোজন বিলাসীকে পরীক্ষা করার জন্য রাজা ভাল পাচক ডেকে যতরকমের ভাল খাবার হতে পারে সবরকম রান্নার আদেশ দিলেন।

রাজার আদেশে পাচক খুব যত্ন করে নানারকম সুখাদ্য রান্না করে রাজাকে জানাল।

রাজা তখন ভোজনবিলাসীকে সঙ্গে করে আহার স্থানে উপস্থিত হলেন এবং তাকে আহার করতে বললেন; কিন্তু সে কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার কাছে ফিরে এল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছ তো?

সে বললো, না মহারাজ! খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

সে বললো, মহারাজ, ভাতে শবগন্ধ বের হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছে শ্মশানের কাছের কোন ক্ষেতের ধান থেকে ঐ চাল হয়েছে।

রাজা এই কথা শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। ভাবলেন পাগলের প্রলাপ ছাড়া এ আর কিছুই নয়। রাজা তখন কোন কথা না বলে গোপনে ব্যাপারটার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য ভাণ্ডারিকে আদেশ দিলেন।

রাজার আদেশমত ভাণ্ডারী শবিশেষ অনুসন্ধান করে রাজাকে জানালেন, মহারাজ! গ্রামের শেষ প্রান্তে যে শ্মশান আছে তার পাশের ক্ষেতের ধান থেকেই ঐ চাল হয়েছে।

রাজা শুনে অবাক হলেন এবং ভোজনবিলাসীকে বাহবা দিয়ে বললেন, তুমি যথার্থ ই ভোজনবিলাসী।

এরপর রাজা এক সুসজ্জিত শয়ন ঘরে দুধের মত সাদা উৎকৃষ্ট এক শয্যায় শয্যাবিলাসীকে শুতে দিলেন।

সে অল্পক্ষণ পরেই রাজার কাছে এসে বললো, মহারাজ, শয্যায় আমার শোয়া হল না।

রাজা বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে শয্যাবিলাসী বললো, মহারাজ! ঐ শয্যার সপ্তমতলে একটি চুল আছে; আতে আমি বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলাম তাই উঠে এসেছি।

রাজা হতবাক! এও কি সম্ভব? রাজা নিজে সেই শয়ন ঘরে ঢুকে বিছানার সপ্তমতলে সত্যিই একটা চুল পেলেন।

রাজা খুশি হয়ে তার প্রশংসা করে বললেন, তুমি প্রকৃতই শয্যা-বিলাসী।

এরপর রাজা সন্তুষ্ট হয়ে দুই ভাইকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, মহারাজ! এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কে সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য ?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

রাজার উত্তর শুনে বেতাল আর একমুহূর্তও না থেকে গাছে গিয়ে ঝুলে পড়লো।

কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্য কি তাকে ছেড়ে দেবেন? তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন।

আর বেতালও তখন বাধ্য হয়ে তার চতুর্বিংশ গল্প আরম্ভ করল।



চতুর্বিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলল—মহারাজ !

কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর কোন পুত্র না থাকায় অনেক দেবতার কাছে একটি পুত্র প্রার্থনা করার পর পুত্র লাভ করেন।

পুত্র অল্প বয়সেই সবরকম শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠল। বাবা-মার সেবা তার কাছে ছিল পরম ধর্ম।

বাবা-মার ভাগ্য খারাপ ছাড়া আর কি বলব। এমন গুণবান পুত্রের বয়স যখন আঠার বছর তখন তার মৃত্যু হল।

বাবা-মার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। দুজনে অনেক কান্নাকাটি করলেন।

মৃতদেহ সৎকারের জন্য গ্রামের সীমানায় চিতা সাজালেন।

এক বৃদ্ধ যোগী বহুদিন ধরে ঐ শ্মশানে যোগাভ্যাস করছিলেন। তিনি আঠার বছরের ঐ ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখে ভাবলেন আমার এই জীর্ণশীর্ণ দেহ দিয়ে আর কোন কাজই হচ্ছে না। আমি যদি ঐ ব্রাহ্মণ কুমারের দেহে প্রবেশ করি তবে অনেকদিন যোগাভ্যাস করতে পারব। মনে মনে এই সঙ্কল্প করে যোগবলে তিনি সেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ব্রাহ্মণ কুমার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ফিরে পেল। যজ্ঞশর্মা পুত্রকে ফিরে পেয়ে আনন্দে হাসতে লাগলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বিষণ্ণ মনে

কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

বেতাল এখানেই গল্প শেষ করে রাজাকে প্রশ্ন করল, মহারাজ! ব্রাহ্মণ পুত্রকে ফিরে পেয়ে প্রথমে কেন হাসলেন আর পরে কাঁদলেনই বা কেন?

রাজা বললেন, ব্রাহ্মণ তার মৃত পুত্র জীবিত দেখে আনন্দে প্রথমে হেসেছিল। কারণ সেও অন্য শরীরে প্রবেশ করবার বিদ্যা জানত, ঐ বিদ্যার প্রভাবে পরক্ষণেই জানতে পারলেন ঐ বৃদ্ধ যোগী তার পুত্রের দেহে প্রবেশ করে তাঁকে বাঁচিয়েছেন। সুতরাং তার পুত্র বেঁচে ওঠেনি, যোগীর প্রবেশে এই ঘটনা ঘটেছে। এই জন্য রোদন করলেন।

সঠিক উত্তর পেয়ে বেতাল রাজার কাঁধ থেকে নেমে আবার সেই গাছে গিয়ে ঝুলে পড়ল আর রাজাও তাকে পুনরায় কাঁধে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন।

বেতালও তার পঞ্চবিংশ গল্প আরম্ভ করল।



পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

বেতাল বলল—মহারাজ !

দাক্ষিণাত্যে ধর্মপুর নগরে প্রবল পরাক্রমশালী অন্য এক রাজা ছিলেন, নাম মহাবল। তাঁর চেয়েও পরাক্রমশালী অন্য এক রাজা হঠাৎ একদিন সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজধানী অবরোধ করে ফেললেন।

রাজা মহাবল শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেও দুর্ভাগ্যক্রমে শত্রুকে পরাজিত করতে পারলেন না। তাঁর প্রায় সমুদয় সৈন্য বিনিষ্ট হয়ে পড়ল। অগত্যা তিনি বাঁচবার কোন উপায় না দেখে রাজমহিষী ও রাজ কন্যাকে নিয়ে গভীর বনে পালিয়ে গেলেন।

অনেক পথ হাঁটায় তিনজনই ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লেন। তখন রাজা স্ত্রীও কন্যাকে একটি গাছের তলায় বসিয়ে খাদ্যের সন্ধানে বের হলেন।

এদিকে দিনের আলো নিভে যেয়ে অন্ধকার নেমে এল বনে। রাজা ফিরছেন না দেখে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা নানা অনিষ্টের আশঙ্কা করে খুবই কষ্ট পেতে লাগলেন।

ঐদিনই কুন্তিনের রাজা চন্দ্রসেন তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে মৃগয়া করতে ঐ বনে ঢুকেছিলেন।

তাঁরা ঐ গভীর বনের মধ্যে মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। এবং আরও বিস্মিত হলেন এই দেখে যে ঐ পায়ের চিহ্ন স্ত্রীলোকের।

রাজা বললেন, পায়ের চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই এখান দিয়ে গিয়েছে। চল খুঁজে দেখি তাদের পাওয়া যায় কি না।

পিতা-পুত্র দুজনে খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যার মুখে দেখলেন দুটি পরমাসুন্দরী নারী গাছের নীচে বসে একে অপরের দিকে চেয়ে কাঁদছে।

এই অবস্থা দেখে তাঁদেরও খুব দুঃখ হল। তাঁরা অনেক করে তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত করলেন এবং সসম্মানে তাঁদের রাজধানীতে নিয়ে গেলেন।

কিছুদিন পর রাজা রাজকন্যাকে ও রাজপুত্র রাণীকে বিয়ে করলেন।

গল্প এখানেই শেষ করে বেতাল বললো, বল রাজা এই দুটি নারীর সন্তান জন্মালে তাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হবে? প্রশ্ন শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য একটু হাসলেন—কোন কথার উত্তর দিলেন না।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন লাভ

(তাল বেতালের উৎপত্তি)

বেতাল মনে মনে ভাবল—রাজা আমার পঞ্চবিংশ উপাখ্যানের উত্তর দিতে না পেরে হাসলেন। কিন্তু আমি রাজার সাহস ও অধ্যবসায় দেখে বড়ই পরিতুষ্ট হয়েছি। যা হোক এখন দুষ্ট যোগীকে শাস্তি দিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের উপকার করতে হবে। এই চিন্তা করে সে বলল—মহারাজ? যে যোগী তোমাকে শব আনতে পাঠিয়েছে তার নাম শান্তশীল, সে জাতে কুমার। আর যে শব নিতে এসেছ এটা হল ভোগবতীর রাজা চন্দ্রভানুর শব। শান্তশীল যোগ-সিদ্ধির জন্য অনেক কৌশলে চন্দ্রভানুকে হত্যা করেছে। এখন তোমাকে হত্যা করতে পারলেই তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এজন্য আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—যোগীপূজা সমাধান করে তোমাকে বলবে মহারাজ দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। তাঁর কথায় তুমি যেমন দণ্ডব্য হয়ে প্রণাম করবে, তখনই খড়্গাঘাতে সে তোমার প্রাণ সংহার করবে। অতএব তুমি প্রণাম না করে বলবে—আমি রাজা। কাউকে কোনদিন প্রণাম করি না, আর জানিও না যে প্রণাম কেমন করে করতে হয়। যদি আপনি দেখিয়ে দেন আমি আপনার আদেশ পালন করতে পারি।

তোমার কথামত সে যখনই দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতে যাবে তুমি তৎক্ষণাৎ খড়্গ দিয়ে তার মাথাটা কেটে ফেলবে আর দেবী মন্দিরের নিকট দেখতে পাবে চুল্লীর উপর ফুটন্ত তেলের কড়া আছে! সেই ফুটন্ত তেলে যোগী ও চন্দ্রভানুর শব ফেলে দিও। তা হলেই তাল বেতাল উৎপত্তি হয়ে তোমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাকবে। আর তুমি সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্রী রাজা হয়ে সুখে থাকবে।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে সাবধান করে দিয়ে চন্দ্রভানুর শব ত্যাগ করে প্রস্থান করল। তারপর বিক্রমাদিত্য সেই শব নিয়ে যোগীর



“রাজা খড়্গাঘাতে যোগীর শিরচ্ছেদ করলেন”···পৃঃ ১৩৬

নিকট উপস্থিত হলে যোগী মহানন্দে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। অতঃপর যোগী পূজা সমাপন করে বললেন মহারাজ এইবার দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর এতে তোমার প্রতাপ বৃদ্ধি ও অভীষ্ট সিদ্ধি হবে।

রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালের উপদেশ অনুসারে জোড় হাতে অতি বিনীতভাবে আবেদন করলেন—প্রভু আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে জানি না। আপনি গুরু, কেমন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয় আমাকে দেখিয়ে দিন। যোগী রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম শিক্ষা দিতে যেমন ভূতলে দণ্ডবৎ হলেন তৎক্ষণাৎ রাজা খড়্গাঘাতে তাঁর শিরচ্ছেদ করলেন।

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে দেবগণ বিক্রমাদিত্যের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন—মহারাজ! আমি তোমার সৌভাগ্য দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি, বর প্রার্থনা কর। তখন বিক্রমাদিত্য করজোড়ে বললেন—প্রভু! আপনার ও পূর্বপুরুষের আশীর্বাদে আমার কোনও অভাব নেই। তবে আমার প্রার্থনা এই—যতকাল চন্দ্র, সূর্য ও আকাশ মণ্ডল থাকবে ততদিন পর্যন্ত যেন এই বৃত্তান্ত সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইন্দ্র বললেন—যতদিন চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডল বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমার নাম ও কীর্তি নিশ্চিত ধরাতলে বিরাজ করবে।

রাজাকে বর দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবলোকে প্রস্থান করলেন! অনন্তর রাজা চন্দ্রভানু ও শান্তশীলের মৃতদেহ দুটি তৈল—কটাহে নিক্ষেপ করতেই দুই বিকটাকার বীরপুরুষ তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলল—"মহারাজ কি আজ্ঞা হয়? রাজা বললেন—আমি যখন তোমাদের স্মরণ করব তখন আমার নিকটে এস। তারা সম্মত হয়ে প্রস্থান করল।

এইরূপে তাল বেতালকে লাভ করে মহারাজ বিক্রমাদিত্য হৃষ্টমনে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে অজেয় রাজা হয়ে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন।

—সমাপ্ত—

গয়ারামের গয়াযাত্রা

কান্তি পি দত্ত

